তব বেণুধ্বনি উঠিত গুমরি
সারা প্রান্তর পুলকেতে ভরি
চড়ায়ে পড়িত তান ;
যমুনার বারি উঠিত কাঁপিয়া
কলকল রবে চলিত বাহিয়া
আবেগ পূরিত প্রাণ।
কুসুম বিতান উঠিত দুলিয়া
ভাবহিল্লোলে পড়িত হেলিয়া
ফেলিত সুরভি শ্বাস,
মাথার উপর অমল ধবল
চারু ইন্দুর কিরণ তরল
লুটাত মধুর হাস।
এখনো সে সব পড়িছে স্মরণে,
যে অমৃত স্বাদ পেয়েছি জীবনে,
পুলকে ভরিত প্রাণ,
মুগ্ধ পরাণ হারাত চেতনা
তোমার চরণে সঁপিত কামনা
জপ তপ কুল মান।
তুমি যে আমার পিপাসার বারি
জীবন জুড়ান প্রেম তৃষাহারী
অফুরাণ প্রেমাধার,
সকল অভাব মিটায়েছ মোর
প্রেমের স্বপনে রেখেছ বিভোর
বিলায়েছ প্রীতিভার।
তোমার আদরে যবে মোর হিয়া
অসহ পুলকে উঠিত কাঁপিয়া
অবশ এ দেহলতা,
ধীরে ধরে তুমি কোলেতে টানিয়া
বাহুবেষ্টনে রেখেছ বাঁধিয়া
জাগায়েছ নবীনতা।
এস পুন আজ হে পরাণ স্বামী !
পুরায়ে বাসনা অন্তরযামী
ধরিয়ে মোহন সাজ—
এস এস মোর পরাণ ভুলান
এস এস মোর জীবন জুড়ান
এস হে হৃদয় রাজ।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] [শ্রাবণ, ১৩২৮ সাল।

শ্রাবণে

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

আজ, শ্রাবণ ঘন নিবিড় মেঘে
আকাশ ছেয়ে আসে,
সন্ত্রাসিতা বসুধা কা'র
উন্মাদনার ত্রাসে !
এধার ওধার চমকে চিরে'
আলোর করাত বেড়ায় ফিরে'
নিঝুম বাতাস না জানি কার
কোন্ ইসারার আশে,
ব্যথার মত নিবিড় ঘন
মেঘের সারি ভাসে !

ওই আসে, ওই আসে বুঝি
ঝড়ের হানা হানি !
অভিসারের সাজটী আমার
দাও গো এবার আনি' !
পিয়ার মিলন লগন এযে
রাধা এখন রইবে সেজে'
বাঁশী কখন্ উঠ্‌বে বেজে
কিছুই যে না জানি,
বাইরে যে ওই মেঘের ঘটা
ঝড়ের হানা হানি !

ঝঞ্ঝা নয় রে বাদল নয় রে,
ওই যে মহোৎসব !
নূপুর রুনু ডুবাবে মোর
দেয়ার গুরুরব।

আকাশ ভরা ওই যে কাহার
নীলাম্বরীর জরীর বাহার,
সাড়ীর সাথে মিশ্‌বে রে মোর
নিশির অন্ধকার ;
অলঙ্কারের শিঞ্জিনী কেউ
শুন্‌বে না আজ আর !

শ্রাবণ নিশার আঁধার রে আজ
গভীর হ'য়ে আসে,
এই লগনে আজকে তোরা
একলা রবি বাসে ?
বাতাস ডাকে 'আয় চলে আয়',
মাতাল সে আজ কিসের নেশায়,
হিন্দোল দোলায় দোলাতে তায়
আকুল কেশ পাশে,
শ্রাবণ নিশার-আঁধার যে ওই
জমাট হ'য়ে আসে !

———

বাঙলা কাব্যে একটী নূতন সুর

[অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম, এ।]

যে নূতন কবির নূতন সুরের কথা আজ বলিব তিনি অনেকের অপরিচিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। যতীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি শীঘ্রই পুস্তকাকারে "মরীচিকা" নাম দিয়া প্রকাশিত হইবে—আশা করি তখন তাহার বিশেষ সুরটি সাধারণের নজরে পড়িবে। আমি শুধু তাঁহার "ঘুমের ঘোরে" নামক কবিতাগুলি হইতেই নূতন সুরটী কি তাহা দেখাইব। এই কবিতাগুলি পূর্ব্বে "যমুনা"য় প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণের দৃষ্টি যতটা আকর্ষণ করা উচিত তাহা করে নাই। যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায় প্রভৃতি কবিগণ কবিতাগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আমিও এগুলির ভিতর একটি নূতন সুরধ্বনি পাইয়াছি ; কবিতার ভিতর দিয়া এমন একটা বিদ্রোহ ভাব বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই। কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় কাব্য কালান্তক রস আবিষ্কার করিয়া "যমুনা"য় কিছু কাল আগে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। ইহাতে নূতন কবিতা, পুরাতন কবিতা, ঘুষঘুষে কবিতা, প্রবল কম্প কবিতা, পালা কবিতা, বিষম কবিতা, ধোঁয়া ধোঁয়া কবিতা, ছোঁয়াচে কবিতা, একমাস অন্তর কবিতা, চাকরী চাপা কবিতা প্রভৃতি যেরূপ কবিতা রোগই হউক না কেন নিশ্চয় ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। বুকজ্বালা, মন হুহু করা চোখে ঝাপসা দেখা, প্রাণ কেমন করা, রাত্রে নিদ্রা না আসা, পেট ফাঁপা, মাঝে মাঝে হাত শুড় শুড় করা, ইত্যাদি উপসর্গ এক বটিকা সেবনেই উপশমিত হইবে। বিশেষ চেষ্টায় বেতস, বিছুটি প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি দেশীয় গাছগাছড়ায় এই মহৌষধ প্রস্তুত। পথ্যের কোন ধরাকাটা নাই। কেবল ঔষধ ব্যবহারের সময় ও পরেও একমাস জ্যোৎস্না লাগান, ফুল শোঁকা এবং মাসিকের সম্পাদকের সহিত পত্র বিনিময় নিষিদ্ধ।"

এ হেন কাব্য কালান্তক রসের আবিষ্কর্ত্তা যতীন্দ্রনাথের হাত হইতে কি করিয়া কবিতা বাহির হইল, ইহাতে অনেকের বিশেষ সন্দেহ হওয়ার কথা।

ওমর খৈয়ামের কবিতার সঙ্গে আমাদের কবির লেখার জায়গায় জায়-

গায় বেশ মিল আছে। "ওমরের কবিতায় কেহ কেহ কেবল মদিরার গন্ধ আর রূপসীর পাতলা ঠোঁটের জিয়ান রসের স্বাদ পাইয়াছেন, কিন্তু ওমর খৈয়াম যেমন 'ব্রহ্ম মিথ্যা' কখনও বলেন নাই, তেমন শুধু নাচ, গান, পান করার তথ্য প্রচার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। যদি বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইত তাহা হইলে তাঁহার কবিতা ব্যর্থ ও নিকৃষ্টতর হইত। প্রকৃত পক্ষে এ কবিতাগুলি অভিমানের ও বিদ্রোহের কবিতা। কবি বলিতেছেন "হে শাস্ত্রকার, তুমি আমাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারিবে না অথচ আমাকে শত সহস্র 'না'র মধ্যে জড়াইয়া আমার জীবনটাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে—তাহা হইবে না। আমি তোমার কথা মানিব না। হে আমার চিত্ত, তুমি কেন বৃথা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস পাইয়া কষ্ট পাইতেছ? এস বিশ্রাম কর। অর্থহীন তর্ক ছাড়িয়া দিয়া চল আমরা নিভৃতে গিয়া কোনও তরুণীর অধর সুধা পান করিয়া শ্রান্তি দূর করি।

"কিন্তু ওমরের চিত্ত কি এই আহ্বান শুনিয়াছিল? ওমর কি আপন ইন্দ্রিয়ের সেবায় মগ্ন হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বিস্মরণ হইয়াছিলেন? না তাহা নহে। এ ক্ষণিকের বিদ্রোহের পরেই আবার মন সেই পুরাতন চিন্তা লইয়া ব্যস্ত হইত। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত তখন এক একবার হৃদয়ে বিরক্তির উদয় হইত এবং তখনই এই শ্রেণীর কবিতার জন্ম হইত।"

যতীন্দ্রনাথ ঘুমের ঘোরে অবসন্ন হইলেও ভগবান এবং সংসারটাকে একবারে সাদা চোখে দেখিয়া ফেলিয়াছেন এবং উপরের রংচঙে না ভুলিয়া ভিতরকার খড় বাঁশ টানিয়া বাহির করিয়াছেন। এই বাস্তবতার প্রতি ভক্তি এবং অবাস্তবতার উপর নিদারুণ বিদ্রোহ বাঙলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম ধ্বনিত করিয়াছেন।

আজকাল একটা ফ্যাসান হইয়াছে যে কবিতার ভিতর কথায় কথায় ভগবানকে লইয়া টানা হ্যাঁচড়া করা। অসীম লইয়া সীমার ভিতর নাড়াচাড়া করা, দুঃখকে সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা, যন্ত্রণাকে দেবতার মঙ্গল দান বলিয়া লইতে বলা—ইহাই কবিদের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনে যিনি সত্যই ইহা অনুভব করেন, তিনি এরূপ কথা বলুন আপত্তি নাই, কিন্তু যার তার মুখে এসব কেবল কথার গাঁথুনি মাত্র বলিয়া বোধ হইবে—ভাবহীনের অসারতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। তাই যতীন্দ্রনাথ বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া বাস্তবকে বাস্তবের আকারে দেখিবার জন্য বলিলেন—

অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে;
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে।
দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল—ভাবি দেবতার দান,
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান!
—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের পূর দিনে দিনে পড়ে চাপা।
কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা!
কোথা সে অগ্নিবাণী!
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্ত্তিখানি?
কালোকে দেখাবে কালো ক'রে আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো;
পুড়ে উড়ে যাবে বাজারের যত বর্ণ ফেরানো গুঁড়ো!
খেলোয়ারি প্যাঁচ দূরে গিয়ে কবে তীরের মতন কথা,
বর্ম্ম ভেদিয়া মর্ম্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্ম্মব্যথা।
এ কথা বুঝিবে কবে?
ধান ভানা ছাড়া কোন উচুঁ মানে থাকে না ঢেঁকির রবে।

ইংরেজ কবি সুইনবার্ণের ভাবের সহিত দু এক জায়গায় আমাদের কবির ভাবের মিল আছে। ইবসেন, বার্ণার্ড শ প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকগণ সত্যের এই নগ্নমূর্ত্তি উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রিয়তম মৃত্যুশয্যায় কাতর—বহুদিন শুশ্রূষা করিতে করিতে নারীর দেহ মন প্রাণ অবসন্ন—এমন সময় প্রিয়তমের মৃত্যু হইলে শুশ্রূষাকারিণীর মনে প্রিয়তমের দুঃখ শান্তি হইল বলিয়া হয় ত যে একটু আনন্দ হয়; তাহার পিছনে নিজের ক্লেশের অবসাদ জনিত আনন্দ লুক্কায়িত থাকে কি না ইউরোপীয় কবি বুকে হাত দিয়া দেখিতে বলিতেছেন। বাস্তবিক কথাটার স্পষ্ট সত্য জবাব দেওয়ায় সাহসের দরকার বটে! আমাদের কবিও বলিতেছেন!—

মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম্মে জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।
প্রেম ও ধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন বলিলে আমি এ কথা,
মিথ্যা মাত্র বৃথা নহে যদি ঘুচে তাহে কারো ব্যথা।

আমাদের রোগ এই যে কবিতা পাইলে তাহার এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

খাড়া করিয়া থাকি। জীবনের ছোট বড় সকল ঘটনাতেই যেখানে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি কারণ না পাইয়া পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসে আমরা সেখানে সত্য মিথ্যা একটা উদ্দেশ্য দর্শাইয়া নিজের মনটাকে প্রবোধ দিই। ইহাতে মানসিক বলহীনতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই বলিয়াছেন যে একজন স্পষ্টবাদী সরল নাস্তিককে তিনি একজন অবিশ্বাস সম্পন্ন আস্তিকের অপেক্ষা বেশী ধার্ম্মিক মনে করেন। গুঁতোর চোটে প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে—সংসারের ভাষায় যাহাকে দুঃখ কষ্ট বলে তাহা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতেছি, অথচ মুখে বলিতেছি—ওটা সুখেরই একটা রূপান্তর মাত্র, এবং ভগবানকে ইহার মঙ্গলময় দাতা বলিয়া অভিনন্দন করিতেছি।

তাই কবি বলিতেছেন—

আমরা যখন সুখে সুখী হই—সে নহে তোমার দান,
তোমার বিধান নহে যে আমরা দুখে হই ম্রিয়মাণ,—
কেন যে এ সব আছে,
সে কৈফিয়ৎ তুমি কোনদিন দেবে না কাহারও কাছে।
সাগরের কূলে পুরী তব দারু মূরতি জগন্নাথ ;—
রথের চাকায় লোক পিষে যায় তোমার নাহিক হাত !
তুমি শালগ্রাম শিলা ;—
শোওয়া বসা যার সকলি সমান তারে নিয়ে রাস লীলা !

কবির বিদ্রোহ এইবার পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন ভগবান যদি থাকেন তো তিনি সৃষ্টি করিয়াই খালাস—সৃষ্টির উপর আর তাঁহার কোনো হাত নাই। তাঁহার চন্দ্র তপন তারকা সকলই ঘড়ির মত চলিতেছে। "থাক্ বা না থাক্ স্রষ্টা—নিখিল বিশ্ব ঘুরে ঘুরে মরে তুমি তার চির দ্রষ্টা। আর জগৎটা—

চারি পাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া,
আলো আঁধারের গরাদে বসান অপার বিশ্ব কারা।
এরি মাঝে ঘুরে তারকা তপন বহিয়া কাহার বোঝা !
এরি মাঝে উড়ে কোকিল, পাপিয়া, হাঁড়ি চাঁচা, কাদাখোঁচা।
পথ নাই পালাবার ;
উঠে, প'ড়ে, ছুটে, ঘুরে ঘুরে লুঠে, কেবল শ্রান্তি সার।

যুগ যুগান্ত ভ্রমণ ক্লান্ত নিশ্চল কত গস্তি,
ফাঁকি খুজে কত মহাতপনের নিবিল আঁখির জ্যোতি।
তবু নাই কারো ছুটি,
অভ্যাস ঘোরে হাতাড়িয়া মরে আঁধারেতে মাথা কুটি।
অসীমের কারাগার—
যত যেতে চাও তত যাও, শুধু বেড়ায় মিলে না পার।
এত বড় খাঁচা মুক্তির ধাঁচা বিদ্রূপ করো না ক'।
সীমা নাই যার, নাহিক দুয়ার, না বন্ধ নহে খোলা,
গাছে গাছে দাঁড় হাজার হাজার, দাঁড়ে দাঁড়ে দেওয়া ছোলা।
এ ব্যঙ্গ কিসে সহি ?
কয়েদে যখন ব্যবস্থা কর কয়েদীর মত রহি।

বিদ্রোহী মন উপায় নাই দেখিয়া বলিতেছে—

নচেৎ মুক্তি দাও
চারিদিকে এই অসীমের সীমা একবারে খুলে নাও।
জীবন মরণে কর্ম্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন কাটে না আমার দিন।
নাহি যবে প্রয়োজন,
আমার মাথায় আকাশের মেঘ করিবে না গরজন।
বুঝি প্রয়োজন বহিবে পবন, প্রয়োজনে ঝরে বৃষ্টি
আপনারে ঘিরে প্রতি মুহূর্ত্তে গড়িব আপন সৃষ্টি।
যবে পুনঃ হবে সাধ,
প্রাণ ভ'রে কেঁদে ধুয়ে মুছে দেব নিজে গড়া অপরাধ।
যদি ভাল লাগে ভালবেসে তোমা ডাকিব বন্ধু ব'লে
সমানে সমানে ছলনা বিহীন দিন যাবে কুতুহলে।

মানবের স্বাধীন ইচ্ছা নাই—যদি চান ভগবান কোনোদিন Mr. Montagur মত কাহাকেও পাঠাইয়া আমাদিগকে reforms দিতে চান তাহা হইলে কবি বর্ণিত এই democratic equality এবং free will আমরা চাহিব। আর এখন কি আছে—

বন্ধু গো আমি জানি হেথা চির ভোটহীন অধীনতা,
নিরুপায় হ'য়ে কেহ বলে তোমা পিতা, কেহ বলে মাতা।

আমি বলি, কিনে কুলো
পিঠে বেঁধে দাও গভীর নিদ্রা, দু'কানে গুঁজিয়া তুলো।

লাট্টুর সহিত একটি উপমা দিয়া কবি বুঝাইতেছন যে আমাদের জীবনে কি খেলা চলিতেছে তাহা আমরা জানি না—সেই খেয়ালী খেলোয়াড়ই জানেন। তাঁহার আনন্দ কিসে তাহা তিনি নিজেই বুঝেন আমরা কেবল মিথ্যা একটা লক্ষ্য জীবনে আরোপ করিয়া নিজেরা ঘুরিয়া মরি।

ছেলেরা লাট্টু খেলে,
লেতিতে জড়ায়ে মুঠায় ঘুরায়ে বোঁও ক'রে ছুড়ে ফেলে
বম্ বন্ বন্ ঘুর ঘুর পাক চিতেন কেতেন সোজা;
লাট্টু বলিছে "হায় হায় হায় ঘুরে ঘুরে কারে খোঁজা।
জীবন যে আসে ফুরায়ে।"
বলিতে বলিতে ফুরাল ঘুরণ—বালক লইল কুড়ায়ে।
আবার লেতিতে জড়ায়ে লাট্টু গপ্‌চা মারিয়া ফেলে,
একটার ঘায়ে অন্যে ফাটায়ে ছেলেরা লাট্টু খেলে।
দেখিনু দাঁড়ায়ে কোণে,—
ফাটা লাট্টুটা ছুড়ে ফেলে দিল দূরে কণ্টক বনে।

এ স্থলে ওমরের নিম্নলিখিত লাইনগুলি তুলনা করা যাইতে পারে—

"নাইকো পাশার ইচ্ছা স্বাধীন যেই নিয়েছে খেলায় তার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেলছে তারে, যখন যেমন ইচ্ছা তার।
মানুষ নিয়ে ভাগ্য খেলায় করেন যিনি কিস্তিমাৎ—
সবটা জানেন তিনিই শুধু, জয় পরাজয় তাঁরই হাত।"

তাই জীবনের সুখ দুঃখের জন্য সে নিষ্ঠুরের কাছে হাত পাতিয়া কি হইবে—

আমি বেশ জানি সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটাই শ্লেষ
জোর করি দুটি কর,
মাগিব না আমি তুষ্টি তোমার যতই বহুক ঝড়!
আমাদের কাছে তুমিও যে কিছু চাহ না সে জানি আমি;
আপন খেয়ালে ঢালিয়া বর্ষা আপনিই যাবে থামি।

জগতের এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে কবি এই মস্ত নিয়ম আবিষ্কার করিলেন—

একটি নিয়ম মান তুমি সেটি কোন নিয়ম না রাখা
আঁখি মুদে দেখি পাগলের মত ঘুরিছে কালের চাকা।

বলিলেন ইহকাল পরকাল লইয়াও মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—

পূর্ব্বকালে যা ছিনু আজ তার হয় না তো প্রয়োজন
পরকালেতেও যাহবে তাহবে, কেন বৃথা আয়োজন।

যে ভগবান ক্ষুধা দিয়া অন্ন দিয়াছেন আবার জন্ম দিয়া মৃত্যু দিয়াছেন—তাঁহার দান আদান সবই সমান। এ যেন গোরু মেরে জুতা দান—

গোরু পোষাণির প্রায়—
জননীর কোলে ছেলে বড় কোরে কে পুনঃ কাড়িছে হায়!
ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক,
দেঁতো হেসে বলে ইচ্ছাময়েরি ইচ্ছা পূর্ণ হোক;
অন্য অর্থটি—
যাহার পাঁটা সে যেদিকে কাটুক তাহে অপরের কি?

জগতে কত অবতার আসিলেন, কত নূতন নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, কিন্তু জগৎ যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিল—জীবের দুঃখের ভার আর কমিল না—

ঈশা, মূশা আর বুদ্ধ
কণফুসিয়স মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই শুদ্ধ,
সবাই বলেছে পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান;
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর তোমাদেরি তিনি চান।
উপায় পেয়েছি মুখ্য,—
রবে না নরের জরাব্যাধি শোক পাপতাপ আদি দুঃখ।
যেমন জগৎ তেমনি রহিল নড়িল না একচুল
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল!
কি হবে কথার ছলে?
ভগবান চান—তবু হয় না'ক, একথা পাগলে বলে!

এই সব দেখিয়া শুনিয়া কবি শিখিলেন—

চারি দিক দেখে চারি দিকে ঠেকে বুঝিয়াছি আমি তাই,
মাকে শাঁক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।

যদি বল তুমি সুখ দুঃখ নাই দু'টাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশানো ক্রম।
জারি কর তবে খ্যাতি,
এ ভব রোগের নব চিকিৎসা আমার "ঘুমিও প্যাথি।"

হানিমানের হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের পর বিংশশতাব্দীতে কবিবর "ঘুমিওপ্যাথি" আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে সংসারের অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার লাভের জন্য উহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বড় দুঃখেই পরামর্শ দিলেন। দেখিলেন "এজগৎ মাঝে সেই তত সুখী যার গায়ে যত ঘাঁটা," এ সুখ দুঃখের কার্য্য কারণ জন্মান্তরের রহস্যের ভিতর তিনি পাইলেন না। জগৎটা একটা হেঁয়ালি বলিয়া তাঁহার নিকট বোধ হইল—"যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খামখেয়ালি।" বিশ্বস্রষ্টাকে স্তব স্তুতি করা ভুল—যা হবার তা হবেই। "মোরা ভুল ক'রে প্রণমি তোমায় ভুল ক'রে করি রোষ। তোমার তাহাতে নাহি আনন্দ নাহিক অসন্তোষ। আমরা তোমায় ডাকি,—যন্ত্রণা পাই সান্ত্বনা চাই—আপনারে দিই ফাঁকি।"

দার্শনিকের ন্যায় কবি Personal God অস্বীকার করিলেন। তাঁহার ঈশ্বর যেন বেদান্তের নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম। জগৎরহস্য বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, অনিয়মটা সকলের চেয়ে জগতেরই বড় নিয়ম—

জগতের শৃঙ্খলা
স্বপ্নেরি মত উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা
বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।

এতটা শ্লেষ করিয়াও কবি ক্ষান্ত নহেন—মানবের প্রেম নশ্বর এবং তাহা যে বারোটার বেশী রাত্র জাগিলেই অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহাও বলিলেন—অবশেষে "কোন্ অধিকারে আমারে সৃষ্টি করিলে জগন্নাথ"—এতখানি প্রশ্নও করিয়া বসিলেন! মানুষের দর্শন সত্যই ইহার সন্তোষ জনক উত্তর আজও দিতে পারে নাই। কবির এই বিদ্রোহ ভাবের পরিচয় পাঠক পাইলেন। ইহার মূল বেদান্তের ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু তিনি ঢেঁকির শব্দে ধান ভানা ছাড়া আর কোনও মানে যে নাই—তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন। এখন আমরা সংসারটাকে সেই ভাবে দেখিতে পারিব কি?

সুখের ঘর গড়া।

একাদশ পরিচ্ছেদ

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।]

সেই দিনই বিকাল বেলা গেঁড়া সরকার ভোলানাথের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরকার ভোলাকে জানাইল যে চৌধুরী মশাই তাহার সহিত একবার দেখা করিতে চান। ভোলানাথ ইতিপূর্ব্বে জমীদার-তর্ক-সিদ্ধান্ত-সাক্ষাৎ সম্বাদ অবগত হইয়াছিল; সন্ধাদের ফলাফলও যে না জানিয়াছিল তা নয়, ব্যাপার যে রকম দাঁড়াইতেছে তাহাতে সে ভয় পাইয়া গেল। চৌধুরী মহাশয় উপযাচক হইয়া দেখা করিতে চাইয়াছেন শুনিয়া সে উদ্বিগ্ন হইল, এবং কারণ কতকটা মনে মনে আন্দাজ করিয়াও সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন বল্‌তে পারেন সরকার মশাই?

গেঁড়া। কেমন করে বলবো ভায়া—বড়লোকের মনের ভাব আমরা কি করে জান্‌বো সরকারের যে তা জানা নাই এ কথা ভোলা বিশ্বাস করিতে পারিল না; তবে কি জানি কি অপ্রিয় কথা শুনাইয়া বসিবে সেই ভয়ে সে আর জিদ্ করিল না। কাঁধে চাদরটা ফেলিয়া মহেশের বৈঠকখানার অভিমুখে চলিল। গেঁড়া সরকার অন্যত্র কাজের অছিলা করিয়া আর একদিক দিয়া চলিয়া গেল।

ভোলানাথ সভয়ে মহেশের বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মহেশ ও জীবন ভট্টাচার্য্য ও দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বসিয়া ফিস ফিস করিয়া কি আলোচনা করিতেছে। ভোলানাথ ঘরে ঢুকিবামাত্র মহেশ বিদ্রূপের সুরে আহ্বান করিয়া বলিল—"আরে মাষ্টার যে! এস, এস আর যে বড় এ দিক মাড়াওনি হে, ব্যাপারটা কি?"

ভূষণ আড্ডি সুর করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—'এ পথ মাড়ালে বঁধু কোন ভুলে ভুলিয়া?'

ভোলানাথ একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল "হ্যাঁঃ কদিন আসিনি বটে—ভারি ঝঞ্ঝাটে পড়িছি—

ম। কি ঝন্‌ঝাট্ হে শুনিই না—কি নাকি যজ্ঞি ফেঁদে বসেছ—

ভো। যজ্ঞিই বটে তা—

ম। কি রকম যজ্ঞি—কিসের কিরূপ?

জীবন। শিবরহিত যজ্ঞ—এইরূপ—

ম। (চাপা হাসি হাসিয়া) শিবরহিত যজ্ঞ! সে কিরূপ ভট্‌চাজ? শিবটী কে?

জী। আবার কে—আপনি?

ভোলা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তথাপি কিছু উত্তরে বলা তো উচিৎ। বলিল—ভট্‌চাজ আমাকে আর জড়াচ্ছ কেন? আমার সাধ্যি কি কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকাই? বৌদির খেয়াল হয়েছে মেয়েটার মুখে ছুটো ভাত দেয় তাই জনকতক বাউন খাইয়ে একটু উৎসব করা—

ম। উৎসব না মহোৎসব হে? সারা গাঁয়ের বাউন নেমন্তন্ন—আর আমরা অব্রাহ্মণ বলেই বাদ দিলে হে? না হয় তোমার ঢেঁকিশালে পাত পেতে তোমার ভাজের রান্নাটা খেয়ে আসতাম—?

ভোলা। এ রকম ছুঃসাহস কর্‌তে আমাদের ভরসা হবে কেন?

ম। ছুঃসাহস যা করেছ তার চেয়ে এটা আর মাত্রায় বেশী কি?

ভোলানাথ অনির্দ্দেশ্য ভয়ে চমকাইয়া বলিল "কি ছুঃসাহস করিছি বলছেন?"

ম। বাকি কি? ব্যাচারী বাউনদের নেমতন্ন করে তাদের জাতটা মারা কম ছুঃসাহসটা কি?

ভো। চৌধুরী মশাই আমাদের সাধ্যি কি এ কাজ করি? বিশেষ আপনার রাজ্যে বাস করে, আপনার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে—

ম। সাধ্য হয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি যে—তোমার বাটীর কাণ্ড তুমি জাননা? মুসলমান নিয়ে তোমার ভাজ কি কীর্ত্তিটা করেছে জাননা—না জেনেও জাননা হে?

ভো। আজ্ঞে সত্যি কথা বলছি যতটা রটেছে ততটা কিছু নয়—

ম। কতকটা তো বটে হেতা হলেই হলো, বিষ্ঠে কড়ে আঙ্গুল দিয়ে ছুঁলেও অশুদ্ধ আর গায়ে মাখ্‌লেও অশুদ্ধ; তোমার ভাজ ভাইপো না হয় সহরে কেতার লোক; হিঁদুয়াণীর ধার ধারে না; গাঁয়ের বাউন কায়েৎরা তো আর তত আলো পায়নি! একটা হাজার হোক্ আচার বলে জিনিষ আছে পাঁচজনে যখন মেনে চলে তখন পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে হলে মান্‌তেই হবে—কি বল হে ভট্‌চাজ্?

ভট্। (গম্ভীর ভাবে) তার আর ভুল কি পিসেমশাই! শাস্ত্রেই আছে—

"আচারে রক্ষতি ধর্ম্মং অনাচারে ধর্ম্মহানিং
অনাচারী দেবদ্বিজং নরকং যান্তি সবংশং"

ম। শুনলে মাষ্টার? ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের ভাই ভাগ্যিস্ বেশী বিদ্যে হয় নি—সে যাগ্ কাজটা ভাল হচ্ছে না মাষ্টার; এতই যদি সাধ হয়েছিল উচ্ছব করতে, জ্ঞাতিভোজন করালেই পারতে। বাউন ব্যাচারীদের এতে টানা কেন? একে তো ফলারের লোভ বাউনের পক্ষে সম্বরণ করা কঠিন—

ভো। আপনি বলেন যদি তা হলে কি বল্‌বো—অনাচার কি হয়েছে তাতো বুঝ্‌ছিনি—

ম। কি মুস্কিল! এত বোধশক্তি কি করে কমে গেল হে? স্নান করে উঠে মুসলমান ছোঁয়া হয়ে ছিল তো? তারপর সেই কাপড়েই বাড়ী ফেরা, ঘর দোরে ওঠা আবার মুসলমানীদের খাইয়ে সেই বাসন নিজে ধোয়া আর ঘরে তোলা এ কি খুব শাস্ত্রসিদ্ধ সদাচার বল্‌তে চাও? ভাজের হাতে বুঝি কিছু পয়সা আছে তার লোভে বুদ্ধি শুদ্ধি বিগড়ে গেল্?

ভো। তিনি তারপর বাড়ীর পুকুরে চান করেছিলেন, আর বাসন যা বলছেন্ তা আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়—

ম। প্রমাণ?

ভো। আমরা মিছে কেন বল্‌বো? তারও তো একটা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে?

ম। আছে যে তার প্রমাণ?

ভো। বিশ্বাস যদি না করেন তা হলে—

ম। আমি করতে পারি তুমি আমার ইয়ার বকসীর একজন—কিন্তু সমাজ? সমাজ তা বিশ্বাস করবে কেন?

ভো। আপনারা কল্লেই সমাজ মানবে—

ম। উহুঁ তা কি হয় সমাজ আমার মাথার ঠাকুর—আমার খাতিরে ন্যায় অন্যায় না বিচার করে মানবে?

ভো। তা হলে কি করতে বলেন?

ম। রীতিমত শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করে জেতে উঠ্‌তে হবে তা না করা পর্য্যন্ত কেউ তোমার বাড়ী পাত পাত্‌তে পারবে না—কেন মিছে একটা দলাদলি ঘটিয়ে নিজেও বিপদে পড়বে আর পাঁচজনকে বিপন্ন করবে?

ভো। দেখুন দেখি এই যে এতকাল দেশে বাস করছি কারুর সঙ্গে জোরে কথাটী কইছি শুনেছেন?

ম। আরে তাইতো বলাবলি করি না হে ,আড্ডি? বলাবলি করি যে ভোলামাষ্টার হঠাৎ এত ভারিক্কের হলো কি করে, এতই বা হঠাৎ কি বলে সম্পন্ন হয়ে উঠ্‌লো কি করে—যে মেয়ের ভাতে যজ্ঞি লাগিয়েছে।

জী। শুধু যজ্ঞি নয় শিবরহিত যজ্ঞি তা বলবেন্—

ভোলা ভট্টাচার্য্যের দিকে একটা নীরব আক্রোশের বক্র দৃষ্টি করিয়া দেখিল জীবন মাথা বা চোখ না তুলিয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছে—মহেশের কথা শুনিয়া বিনীত ভাবে বলিল—

আমার কি ক্ষমতা না সাধ; জানেনই তো বৌদির হঠাৎ সখ্ হল বল্লেন কি মেয়ে ছেলে কি ছেলে নয়—ব্যাটাছেলের মুল্য আছে মেয়ের থাক্‌বে না কেন? আমি আর কি বলি বলুন?—

ম। তাতো দেখছিই হে মেয়ে মানুষ যে মেয়েমানুষ নয় পুরুষের বাবা তা তোমার ভাজ এসে দেখাতে আরম্ভ করেছেন। স্বামী ছিল পয়সাওয়ালা, স্বামী নেই কিন্তু চাল্‌টা আছে তো।

জী। অর্থাৎ বিষ নেই—চক্র আছে।

ভোলা জীবনের এই মৃদু দংশনগুলা সহ্য করিতে পারিতেছিল না, বিশেষ বাড়ীর মেয়েদের লক্ষ্য করে এই যে সব মন্তব্য—সে কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া প্রত্যুত্তর করিল "হাঁ ভটচাজ্ বিষ যা সব পুরুৎ বাউনের বাড়ীর মেয়েদের একচেটে হয়ে গিয়েছে কিনা—

ম। বা মাষ্টার বা! তোফা—সব যে বলে মাষ্টার উল্টো কামড় দিতে পারে না! কি বলহে ভট্‌চাজ্—

ভট্। তাইতো দেখ্‌ছি ঢোঁড়াতেও ছোবল দেয়—

ভো। তা চতুষ্পদ বিশেষে দেয় বৈ কি, তবে কি জান ভট্‌চাজ ঢোঁড়া হলেও সাপ, কিন্তু শিবের মাথায় উঠে হেলেও কেউটে হয় এই আশ্চর্য্য!

ভট্‌চাজ যে কথাগুলার জ্বালা অনুভব করিল না তাহা নহে। কিন্তু চট্ করিয়া উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া জোরে জোরে হুঁকায় টান দিতে লাগিল। যেমন ধূম দর্শনে পর্ব্বত বহ্নিমান অনুমান করা যায়, ভটচার্য্যের উদ্গিরীত ধূম পরিমাণ হইতে বুঝা গেল, মাথায় রাগের টেম্পারেচার কত হইয়াছে।

লগ্ন মাফিক কথা বলিতে পারিলে রসিক লোকেও অতি অপ্রিয় কথায়

আমোদ বোধ করেন ও ভিতরে ক্ষুণ্ণ হইলেও বাহিরে তারিপ্ করিতে ছাড়ে না; মহেশ ও ভূষণ ভোলানাথের কথায় খুব মজা পাইল, ভট্টাচার্য্য চটিবে বলিয়া মজাটা বাহ্য চিহ্নে প্রকাশ করিতে পারিল না।

ভোলা মহেশের কথা গুলার ভঙ্গীভাব মনে মনে পছন্দ করিতে ছিলনা; অথচ নিজের দুর্ব্বলতা বশতঃ যে বাড়ীর কুললক্ষ্মীর প্রতি তীব্র মন্তব্যগুলার প্রতিবাদ করিতে পারিল না ইহাতে সে বড় লজ্জিত ও মর্ম্মাহত বোধ করিল; পাছে আর বেশী কিছু শুনিতে হয় এই ভয়ে সে উঠিয়া পড়িল—মহেশ বলিয়া উঠিল কি মাষ্টার উঠ্‌লে যে?

ভো। দেখি যাই বৌদিদিকে বলে যদি যজ্ঞি বন্দ করতে পারি, মিছিমিছি কেন ফুস্‌কুড়ী চুল্‌কে বরণ তোলা—

ম। তাইতো বলি; বাউনদের ব্যাপার, একটা কাণ্ড যদি হয় তাহলে আমাকে ন্যায় বিচার করতে হলে তোমার দিকতো নিতে পারবো না—মাঝ-খান হতে তুমি ব্যাচারী মারা যাবে কেন? তা ছাড়া বন্ধু বলেই ডেকে সামলে দিলাম, তা না হলে আমার আর এত গরজ কেন? মোদ্দা কথা বন্ধু নারী বুদ্ধিতে আর ঘর মজিওনা আর নিজে মজোনা—

ভোলানাথ আর বিলম্ব করিল না। দেখিতো কি হয় বলিয়া সে মহেশের নৈকট্য ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল।

ভোলানাথ চলিয়া গেলে জীবন ভট্টাচার্য্য হুঁকা রাখিয়া বলিল, "আসল কথা ভোলামাষ্টারকে কেমন মনে হয় আপনার?"

মহেশ। ব্যাচারী গো বেচারা, তবে লক্ষ্মণের মত দেওর বলে বোধ হয় প্রবলা ভ্রাতৃজায়ার কবলে পড়ে গিয়েছে তাল সামলাতে পাচ্ছে না।

ভূষণ আড্ডি একটা বিকট বহরের হাই তুলিয়া জড়িতকণ্ঠে মুদিত চক্ষে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মাষ্টারের ভাজ হঠাৎ এত প্রবলা কি করে হলেন, মাষ্টারের দাদা তো ইতি হয়েছেন—আর মতলবটাই বা কি এই যজ্ঞি করে বাউনদের জাত নষ্ট করার? খোলসা হচ্চেনা উদ্দেশ্যটা।

জীবন। বুঝলে না আড্ডি? পিসেবাবুকে তো বলেছি—লোকনাথ মুখুজ্যে প্রথম ছেলের—সেটী গত—ভাত দেশে এসে দেয় তাতে সহুরে কটী খৃষ্টান্ বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে পংক্তিতে খাওয়াতে চায়, তাইতে খুব হুলস্থুল পড়ে; বাউনরা বেঁকে বসলো খাবেনা, তখন বাছাধন নাকখৎ দিয়ে মান বাঁচান্। সেই অপমানের পর লোকনাথ দেশ ছাড়ে কিন্তু তার পরিবার সে

অপমান ভোলেনি আজ তাই মেয়ের ভাত অছিলায় তার শোধ নিচ্ছেন। বুঝলে গুহ্য কথাটা।.

ভূষণ। তাই নাকি? কি জন্‌জাল্‌! দূর হোক্‌গে ছাই, আবার হাই!

ম। মৌতাতের সময় হয়েছে হে বুঝছোনা—নাও ওঠো—

ভোলানাথ বাস্তবিকই মহেশের চোখ রাঙ্গানীতে ভড়্‌কাইয়া গিয়াছিল। সে বাড়ী ফিরিয়া পত্নীকে সমস্ত কথা শুনাইল। জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বাদ করার মতই যে তার অবস্থা দাঁড়াইতেছে তা সে সদুকে ভাল করিয়া বুঝাইল! সদু বলিল তা দিদি তো বলছে অত ভয় পাবার কারণ নেই? কি আর করবে?

ভো। মন্দ কথা না! কি না করতে পারে? উনি জমিদার আর আমি নগণ্য স্কুলমাষ্টার! ওঁরই আশ্রয়ে প্রতিপালিত এতদিন তো? আজ না হয় বৌদিদি এসেছেন? না ওসব বুদ্ধি করনা - আর উনিই যে কি ভরসায় মেয়ে মানুষ হয়ে প্রবলের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে ভরসা পান তা জানিনি!

স। তা কি করতে বলো?

ভো। কাজ কি এই অন্নপ্রাশনের হেঙ্গাম করে? আমি বলি কি বন্ধ করে দি, সব গোল মিটে যাক ফুসকুড়ী চুলকে ফোড়া করে তোলা কেন?

স। দেখ যা ভাল বোঝ করবে, দিদিকে বুঝিয়ে বলি চলগে—

ভো। চলো তর্কসিদ্ধান্ত মশাইকে নাকি বাবু ডেকে মানা করেন এ বাড়ীতে খেতে না আসেন, তিনি নাকি মুখের ওপর বলেছেন "খেতে যাবই কারোর কথা শুনছিনি"। কথায় বলে রাজারাজড়ায় যুদ্ধ করে উলুবন পুড়ে মরে? আমার হবে দেখছি তাই বৌদিদি যে কিসের জোরে পাহাড়ের গায়ে মাথা ঠুকছে তা জানিনি—

স। তুমি ঝগড়াঝাটী বাধিওনি দিদিকে বুঝিয়ে বলো আগে।

ভো। বলিছিতো একবার, যে পুরুষের বেহদ্দ রোক আর গোঁ—

হঠাৎ যজ্ঞেশ্বরী তথায় উপস্থিত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া প্রতি উত্তর দিলেন—"সাধে এ দেশে মেয়েরা মদ্দানি করে ঠাকুরপো; পুরুষরা যে মেয়েলী হয়ে যাচ্ছে। বিশ্রী একটা উচিৎ কথা বলতে বা উচিৎ কাজ করতে পুরুষরা যদি ভয় পায় তা হলে গেরস্থর মানমর্য্যাদা থাকে কি করে? সে যাগ্‌, ব্যাপারটা কি হয়েছে? তিলকে তাল করে তুলেছে কারা? ভোলানাথ অকস্মাৎ ধরা

পড়িয়া লজ্জিত হইল। সামলাইয়া লইবার জন্য বলিল দাদা থাকৃতেন তো দেখতে আমার সাহস হতো কিনা; কার ভরসায় উচিৎ কাজ করি বলো?

য। ও কথা মেয়ে মানুষে বলবে যারা পর-ভরসার জীব! তুমি পুরুষ মানুষ ও কথা বলোনা ঠাকুরপো—তোমার বৌদি কি এমন গুরুতর অপরাধ করে বসেছে শুনি?

ভো। চৌধুরী মশাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি বলেন তোমার ভাজ এই ম্লেচ্ছ কীর্ত্তি করে এখন কি দেশের বাউনদের জাত মারতে চায়? নিতান্তই যদি—

য। নিতান্তই কি?

ভো। কি নয় বলো? আমার হলো পুঁটীমাছের প্রাণ!

য। (হাসিয়া) মনেই পুঁটী মনেই কাতলা বুঝলে ঠাকুরপো!

ভো। সে যাক্‌, কাল যদি তোমার বাড়ী কেউ পাত না পাতে?

য। তাতে কি?

ভো। গ্রামে মাথা হেট হবে না! একঘরে হওয়া তো?

য। মাথা হেট নিজে করলেই হেট হবে; তা ছাড়া একঘরে কে কাকে করে ভাই? আর আমাদের সে ভয় নাই এস্‌মাইল আছে জমী চষবে, তর্কসিদ্ধান্ত আছেন, মন্ত্র পড়বেন্‌ তুমি আছ বিজু আছে রোজগার করবে;—সদু আছে আমি আছি, কথা কইবো, কাজ করবো, রাঁধবো খাবো আবার চাই কি? কি বলিস সদু?

সদু শুধু হাসিল, মনে মনে দিদির তারিফ করিয়া বলিল—দিদি যে কি মানুষ! ফুঁ দিয়া পাথর ওড়ায়, আর আমরা সরসের চাপে হাঁপিয়ে উঠি।

ভো। যতটা সোজা ভাবছো বৌদি ততটা নয় ব্যাপারটা

য। তুমিও যতটা কঠিন ভাবছো ততটা হবে না—

ভো। ধোবা নাপিত বন্ধ হয় যদি?

য। সাজ্জি দিয়ে নিজেদের কাপড় কাচ্‌বো, নিজেরা নাপিত নাপিতিনি হবো—

ভো। শুধু তাই। ওরা হলেন গাঁয়ের মালিক, আমার মত দীনদুঃখীকে টিপে মারতে কতক্ষণ?

য। অনেক কাট্‌ খড় লাগে ঠাকুর পো! অত সোজা হ'লে দেশের দীন

অপমান ভোলেনি আজ তাই মেয়ের ভাত অছিলায় তার শোধ নিচ্ছেন। বুঝলে গুহ্য কথাটা।

ভূষণ। তাই নাকি? কি জন্‌জাল্‌! দুর হোক্‌গে ছাই, আবার হাই!

ম। মৌতাতের সময় হয়েছে হে বুঝছোনা—নাও ওঠো—

ভোলানাথ বাস্তবিকই মহেশের চোখ রাঙ্গানীতে ভড়্‌কাইয়া গিয়াছিল। সে বাড়ী ফিরিয়া পত্নীকে সমস্ত কথা শুনাইল। জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বাদ করার মতই যে তার অবস্থা দাঁড়াইতেছে তা সে সদুকে ভাল করিয়া বুঝাইল! সদু বলিল তা দিদি তো বলছে অত ভয় পাবার কারণ নেই? কি আর কর্‌বে?

ভো। মন্দ কথা না! কি না করতে পারে? উনি জমিদার আর আমি নগণ্য স্কুলমাষ্টার! ওঁরই আশ্রয়ে প্রতিপালিত এতদিন তো? আজ না হয় বৌদিদি এসেছেন? না ওসব বুদ্ধি করনা - আর উনিই যে কি ভরসায় মেয়ে মানুষ হয়ে প্রবলের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে ভরসা পান তা জানিনি!

স। তা কি করতে বলো?

ভো। কাজ কি এই অন্নপ্রাশনের হেঙ্গাম করে? আমি বলি কি বন্ধ করে দি, সব গোল মিটে যাক ফুসকুড়ী চুলকে ফোড়া করে তোলা কেন?

স। দেখ যা ভাল বোঝ করবে, দিদিকে বুঝিয়ে বলি চলগে—

ভো। চলো তর্কসিদ্ধান্ত মশাইকে নাকি বাবু ডেকে মানা করেন এ বাড়ীতে খেতে না আসেন, তিনি নাকি মুখের ওপর বলেছেন "খেতে যাবই কারোর কথা শুনছিনি"। কথায় বলে রাজারাজড়ায় যুদ্ধ করে উলুবন পুড়ে মরে? আমার হবে দেখছি তাই বৌদিদি যে কিসের জোরে পাহাড়ের গায়ে মাথা ঠুকছে তা জানিনি—

স। তুমি ঝগড়াঝাটী বাধিওনি দিদিকে বুঝিয়ে বলো আগে।

ভো। বলিছিতো একবার, যে পুরুষের বেহদ্দ রোক আর গোঁ—

হঠাৎ যজ্ঞেশ্বরী তথায় উপস্থিত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া প্রতি উত্তর দিলেন—"সাধে এ দেশে মেয়েরা মদ্দানি করে ঠাকুরপো; পুরুষরা যে মেয়েলী হয়ে যাচ্ছে। বিশ্রী একটা উচিৎ কথা বলতে বা উচিৎ কাজ করতে পুরুষরা যদি ভয় পায় তা হলে গেরস্থর মানমর্য্যাদা থাকে কি করে? সে যাগ্‌, ব্যাপারটা কি হয়েছে? তিলকে তাল করে তুলেছে কারা? ভোলানাথ অকস্মাৎ ধরা

পড়িয়া লজ্জিত হইল। সামলাইয়া লইবার জন্য বলিল দাদা থাক্‌তেন তো দেখতে আমার সাহস হতো কিনা; কার ভরসায় উচিৎ কাজ করি বলো?

য। ও কথা মেয়ে মানুষে বলবে যারা পর-ভরসার জীব! তুমি পুরুষ মানুষ ও কথা বলোনা ঠাকুরপো—তোমার বৌদি কি এমন গুরুতর অপরাধ করে বসেছে শুনি?

ভো। চৌধুরী মশাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি বলেন তোমার ভাজ এই ম্লেচ্ছ কীর্ত্তি করে এখন কি দেশের বাউনদের জাত মারতে চায়? নিতান্তই যদি—

য। নিতান্তই কি?

ভো। কি নয় বলো? আমার হলো পুঁটীমাছের প্রাণ!

য। (হাসিয়া) মনেই পুঁটী মনেই কাতলা বুঝলে ঠাকুরপো!

ভো। সে যাক্‌, কাল যদি তোমার বাড়ী কেউ পাত না পাতে?

য। তাতে কি?

ভো। গ্রামে মাথা হেট হবে না! একঘরে হওয়া তো?

য। মাথা হেট নিজে করলেই হেট হবে; তা ছাড়া একঘরে কে কাকে করে ভাই? আর আমাদের সে ভয় নাই এস্‌মাইল আছে জমী চষবে, তর্কসিদ্ধান্ত আছেন, মন্ত্র পড়বেন্‌ তুমি আছ বিজু আছে রোজগার করবে;—সদু আছে আমি আছি, কথা কইবো, কাজ করবো, রাঁধবো খাবো আবার চাই কি? কি বলিস সদু?

সদু শুধু হাসিল, মনে মনে দিদির তারিফ করিয়া বলিল—দিদি যে কি মানুষ! ফুঁ দিয়া পাথর ওড়ায়, আর আমরা সরসের চাপে হাঁপিয়ে উঠি।

ভো। যতটা সোজা ভাবছো বৌদি ততটা নয় ব্যাপারটা

য। তুমিও যতটা কঠিন ভাবছো ততটা হবে না—

ভো। ধোবা নাপিত বন্ধ হয় যদি?

য। সাজ্জি দিয়ে নিজেদের কাপড় কাচ্‌বো, নিজেরা নাপিত নাপিতিনি হবো—

ভো। শুধু তাই। ওরা হলেন গাঁয়ের মালিক, আমার মত দীনদুঃখীকে টিপে মারতে কতক্ষণ?

য। অনেক কাট্‌ খড় লাগে ঠাকুর পো! অত সোজা হ'লে দেশের দীন

দুঃখী উজোড় হয়ে যেতো; ওপরে একজন আছেন, তিনি অন্ধ পঙ্গু নন। আমি সে বিশ্বাস রাখি—দেখই না—কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়—

সদু। কিন্তু যদি কেউ খেতে না আসে জিনিষ পত্তর সব তো নষ্ট হবে—

য। তা কেন হবে বোন্? কাঙ্গাল গরীবের অভাব দেশে? তারা এসে খাবে—আমার লক্ষ বাউন ভোজনের পুণ্যি হবে—

ভো। সে না হয় আর একদিন কর না—এটা বন্ধ থাক্।

য। পাগল হয়েছো? তাই হয়? এত কষ্টের আয়োজন, সব পণ্ড হবে?

ভো। তা হয় তো কি হবে! তা বলে প্রবলের আক্রোশে পড়ে মারা যাব—

য। মারাই যায় সবাই! মিছে কেন ভয় পাচ্ছ ঠাকুরপো?—

ভো মিছে নয়—গাঁয়ে বাস করনি, জাননি এখানকার হাল্ চাল্।

য। বেশতো ঠেকে শেখা যাগ্ না—এক কথা—সবাই তো আসবে না জানি; যে দু চার জন আসবে তাদের জন্যে কি করবে? মান রক্ষে করা চাই তো?

ভো। মান রক্ষে করতে গিয়ে যদি অপমান হ'তে হয় তবে এসব কাজে হাত আগে হতে নাই বা দিলুম—

য। বলছি তো দেখাই যাগ্ না! অপমান কিসে? খেতে ডাক্লাম, এলনা—এলনা, বাস্, অপমান কিসের? আমিও বুঝলুম, এর পর আর লোকের সঙ্গে কাঁর কারবার না করলেই হবে?

ভোলানাথ কি বলিতে যাইতেছিল, যজ্ঞেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন—দেখ ঠাকুর পো, যজ্ঞি বন্ধ করতে বল্ছো, তাও ওদের মন্ত্রণায় তো? কিন্তু ওরা যদি তোমাকে আমাকে জব্দ করবার মতলবই করে থাকে তা হলে এই পরামর্শ অনুসারে কাজ কল্লেই জব্দ হবে—

ভো। কিসে?

য। তুমি সব বন্ধ করে নিশ্চিন্তি হয়ে বসে আছ—ওদিকে নেমন্তন্ন হয়ে আছে কাল যখন সব খেতে আসবে?

ভো। কেউ আসবে না; সব জমীদারের কথায় সায় দিয়েছে—

য। তবে তাদের এত মাথা ব্যথা কেন, আমি যজ্ঞি বন্ধ করি আর না করি।

ভো। বোধ হয় তর্কসিদ্ধান্ত যদি আসেন তা হলে তাদের জিদ্ বজায় থাক্বে না, এই ভয়ে—

য। আসল কথা তা নয়—ঠাকুরপো তুমি বুঝলে না, আমি মেয়ে মানুষ হয়েও বুঝেছি। তোমাকে নয় আমাকে, ওরা জব্দ করবে পণ করেছে; আমি যজ্ঞি বন্ধ করলে, ওরা সব আসবে—আর না বন্ধ করলে অধিকাংশ আসবে না—মোট, কথা, একটা গোলমাল ওরা ঘটাবে এঁচে আছে—তুমি চুপ করে থাক দেখাই যাগ্ না কি দাঁড়ায়?

ভো। দাঁড়াবে আর কি একটা দলাদলি—

য। তাতে কি?

ভো। তাতে সব—আমার মত ক্ষুদ্র লোকের গ্রামে টেকা কঠিন হবে—

য। তখন তা বোঝা যাবে—এখন যে দায় তাহতে উদ্ধার হও—লোক জন এসে না অপ্রস্তুত করে তার জন্যে প্রস্তুত হও—

ভোলানাথ ব্যাজার মনে ও বিরক্ত মুখে "যা খুসি করগে"—বলিয়া চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরী সে কথায় কান না দিয়া আপন কাজে গেলেন। সদু ভোলার পিছন পিছন গেল। যজ্ঞেশ্বরী হঠাৎ কি ভাবিয়া উভয়ের পদানুসরণ করিলেন। আড়ালে কান পাতিয়া শুনিতে পাইলেন দেবর বলিতেছে—"তেমন তেমন কিছু ঘটে যদি, তুমি ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাও আমি অন্য কোথাও একটা কাজ নিয়ে থাকিগে পরে যা হয় করা যাবে—মেয়ে বুদ্ধিতে মজে জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করা পোষাবে না"—কথা শুনিয়া যজ্ঞেশ্বরীর চৈতন্য হইল। তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ও জিদের বিরুদ্ধে কথা বলিবার শক্তি না থাকায় দেবর যে অন্তরে অন্তরে বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগ কল্পনা করিতেছে ইহা ভাবিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু এত দূর অগ্রসর হইয়া সবদিক মাটি হইবে ইহা তিনি কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারিতেছেন না। তিনি মুহূর্ত্তেক হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলেন; হঠাৎ ভোলানাথ আসিয়া পড়িল, ভাজকে তথায় তদবস্থায় দেখিয়া তার ভয় ও লজ্জা হইল বোধ হয় তিনি তার গৃহত্যাগের মন্তব্য শুনিয়াছেন—এই সভয় অনুমানটা সুনিশ্চিত সত্য কি না জানিবার জন্য ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল বৌদি এখানে দাঁড়িয়ে? চলে গিছলে না?

য। হ্যাঁ এই মাত্র ফিরে এলাম, তোমার কাছে একটা কথা জান্তে?

ভো। কি?

য। তর্কসিদ্ধান্ত মশায়ের বাড়ী আমি যেতে পারি?

ভো। কেন যাবে না?

য। কথা কইতে পারি? আপত্তি নেই তোমার?

ভো। না আপত্তি কি? তুমি বাড়ীর গিন্নি—অপরে যেটা নিষেধ তোমাতে তা হতে পারে না—

য। দেখ ভাই যে তোমাদের গ্রাম আর পাড়া—

ভো। না।

য। তার সঙ্গে একটা যুক্তি করতে চাই। দেখছি তো তিনিই গ্রামে একমাত্র দুর্ব্বলের বন্ধু; অসহায়ের সহায়—

ভোলানাথের গোপন ভয় ঘুচিয়া গেল। সে নিশ্চিন্ত হইল যে তাহার অসাবধানে উচ্চারিত কথা গুলা যজ্ঞেশ্বরী শুনিতে পান নাই। যজ্ঞেশ্বরীও কৌশলে ধরা না দিয়া দেবরের গোপন ভয়কে ঘুচাইয়া দিলেন। কিন্তু দেবরের কথায় তাঁহার মনে যে অনির্দ্দেশ্য ভয় হইয়াছিল তাহার নিরাস হইল না।

সে দিন সকালে তিনি স্নান করিতে গিয়া ঘাটে একটা আলোচনার ভগ্নাংশ শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহার উপস্থিতি মাত্রেই তাহা থামিয়া যায়; কিন্তু বাড়ী ফিরিবার পথে দক্ষঠাকুরাণীর মুখ হইতে সমস্তটা শুনিতে পান। জীবন-ভট্চাজ্জির পরিবার নাকি বলিতেছিল—"মেয়ে ছেলের ভাত তো কোথাও শুনিনি; তা আবার ভোলার মেয়ের! এ ওর ভাজের খেল্, ঐ অছিলে করে বাউনদের জব্দ করা? কে একজন শ্রোতা বলিল—"জব্দ করা কেন? উত্তরে ভট্টাচার্য্যগৃহিণী বলেন" ওমা :তা জানিনি? কর্ত্তার মুখে শুনলাম লোকনাথ মুখুয্যে নাকি প্রথম ছেলের ভাত দেশে এসে দেয়—তাতে তার এক বেহ্ম বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে বাড়ীতে এনে খাওয়ায় এই নিয়ে বাউনদের মধ্যে কথা ওঠে তাতে বাবু খুব জব্দ হন, মাথা হেট করে সমাজকে তো মান্যি করতে হয়! এখন সেতো মরে গেছে সেই আক্রোশ আছে পরিবার তার সেই আক্রোশ মেটাচ্ছে। বাউনদের জাত মেরে জব্দ করা মাগী কম জাঁহাবাজ গা! তা নৈলে কাঙ্গাল গরীবের আবার মেয়ের ভাত দেবার সখ হয় গা?" শ্রোত্রী-মণ্ডলী ভট্টাচার্য্যগৃহিণীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার তারিপ করিতেছে এমন সময় দক্ষ-ঠাকরুন সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরী তথায় উপস্থিত হইলেন; দক্ষদেবীকে দেখিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলী যে যার স্নান প্রসাধনে ব্যাপৃতা হইল। যজ্ঞেশ্বরীর সেই কথা এখন স্মরণ হইল। তাঁহার ভয় হইল ভোলানাথ যদি সে কথা শুনিয়া থাকে তাহা

হইলে তাহারও তো বিশ্বাস হইতে পারে? যজ্ঞেশ্বরী সাতপাঁচ ভাবিয়া অত্যন্ত উন্মনা হইলেন; কিন্তু বাজে চিন্তায় উন্মনা হলে চলিবে না—বুঝিয়া তিনি কাজের চিন্তায় অন্যমনস্ক হইলেন। তবু এক একবার এই কাথটা মনে উঁকি মারিতে লাগিল "সাধ করে এক করতে গিয়ে শেষে ঘর ভাঙাভাঙি হয়ে যাবে নাকি?"

অকূলের আহ্বান।

(জ্যোতির্ম্ময়ী)

যাই যাই কোথা তুমি কোন্ দূর হ'তে
আহ্বান করিছ মোরে মধুর সঙ্গীতে;
যাই প্রিয় এই যাই
আর তো বিলম্ব নাই
ক্ষুদ্র গৃহে ক্ষুদ্র কাজে তৃপ্ত নহে মন
অসীমে ধরিতে প্রাণ ব্যাকুল এখন।

অনন্তের পথে মোর আজি অভিসার
তোমার সঙ্গীত-মুগ্ধ আকুল হিয়ার।
আজি চিত্ত ছুটে চলে
প্রেম-যমুনার কূলে,
পাসরিয়া লাজ-মান-কলঙ্ক-কালিমা,
বিশ্বকুঞ্জে ধায় আজ পরাণ উন্মনা।

সীমার বাঁধনে প্রাণ বাঁধা নাহি রয়,
শ্বাশুড়ি ননদী গৃহে কত কথা কয়;
কে জানে প্রাণের জ্বালা
হানে বাক্য বিষে ঢালা,
তোমার মিলন পথ রুধিয়া দাঁড়ায়।
রাধারে বাঁধিতে চাহে ক্ষুদ্র সীমানায়।

যাই আমি এই যাই সন্ধ্যাদীপ জ্বালি'
রাধার দিবস-প্রান্তে নেমেছে গোধূলি
প্রিয়তম ক্ষম মোরে
দাসীর বিলম্ব হেরে
ডেকে ডেকে অভিমানে যেয়োনা ফিরিয়া
এই যে এসেছি ছুটে পথে বাহিরিয়া।

ধর্ম্মের বনিয়াদ

(২)

(শ্রীসত্যবালা দেবী)

পূর্ব্বে দেখিয়েছি ভারতের সত্য হচ্চে সর্ব্বত্রকে সমস্তকে অভিভূত করে ব্যাপ্ত যিনি তাঁরি সঙ্গে যোগ। (Consciousness) এই যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারত একদিন দেখেছিল এক স্থির অচঞ্চল অনুদ্বেল সমুদ্রের মত পরম সত্ত্বা রয়েচেন,—আমরা যা কিছু দেখচি সমস্তই হয়েচে হচ্চে এবং হবে,—হয় ত বা একদিন অব্যক্তেই বিলীন হয়ে এই প্রবাহ সুপ্তবৎ অবস্থান কর্ব্বে, আবার জাগবে আবার বিলীন হবে—যেন ওই সমুদ্রের বুদ্বুদ কিন্তু ওই যে পরম সত্ত্বা তিনি স্থির একম্ অদ্বৈতম্—নিষ্ক্রিয়ম্। তাঁরেই অনুভব করে ভারত আপাতঃবিধ্বংসী এই লীলাবিলাসের ওপর অবিনশ্বর একটা কিছু গড়তে পেরেছেন সেইটেই হচ্চে—অমৃতম্। উর্দ্ধের অমৃত লোকে অধিষ্ঠিত হয়ে সে এই নিম্নের দিকে চেয়ে আবিষ্কার করেছিল সমস্ত বিশ্বে চারিটী ভাব—ধর্ম্ম অর্থ কাম,—আর এই তিনের লক্ষ্য স্বরূপ মোক্ষ। সে দেখেছিল মূলে ঐ পরম সত্ত্বা, ঐ অমৃতম্, নিম্নের স্তরে এসে এই চারিটী ভাব নিয়ে চারি খণ্ডে আপাতঃবিক্ষিপ্তবৎ, বিক্ষিপ্ত প্রকৃত নয়। সকলেরই মধ্যে, আনন্দের আভাষরূপে ঐ অমৃতমই আত্মগোপন করে রয়েচেন। তারপর আরও নিম্নস্তরে ঐ চারি ভাবের বিবিধ বর্ণশঙ্কর আর তারই সমাবেশে গ্রথিত এই বিচিত্র জগৎ ব্যাপার।

গীতায় এই জগদ্ব্যাপারকে উর্দ্ধমূল অধঃশাখা অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা

করচে। অশ্বত্থ যেমন অন্ধকার হতে নীরবে আপন জীবন রস আহরণ করে এ জগদ্ব্যাপার তেমনি ঐ দূর অপূর্ব্ব রহস্যাচ্ছন্ন লোক থেকে আপন জীবন রস আহরণ করে। এক কাণ্ডযোগে সঞ্চারিত শত শত শাখা পল্লব পত্রে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের বিকশিত করে তোলে। যেন নীচের থেকে কোনও কিছুই গড়ে ওঠেনি, সব উপরেই গড়া, ঝুলিয়ে ধরা।

সত্যকে স্পষ্ট করে বুঝতে হলে একেবারে ওই উপরকার সত্যকেই (Consciousness) বুঝা আমরা ধরে নিই। ওইখান থেকেই সকল শক্তি এ দিকে আসচে এসে প্রকাশিত হচ্চে মাত্র। সেই প্রকাশিত হওয়াটাই জড়ের বুদ্বুদ বিকাশ। এক্ষণে যেমন যেমন প্রকাশিত হচ্চে আমাদের মন যদি তার আইনগুলো কেবল নাড়াচাড়া করে, সে এই উপকরণ পুঞ্জকেই তাদের অভ্যন্তরে নিহিত প্রবাহের মুখে ফেলে কাজে লাগাতে পার্ব্বে সত্য—প্রকৃতির অন্ধবেগকে নিয়ন্ত্রিত কর্ত্তে পার্ব্বে সত্য—কিন্তু প্রকৃতির হাত থেকে তার ছুটী কই, সেও ত ওই অন্ধবেগেরই অধীন। আর যদিই বা অমন ভেল্কি একটু আধটু আমরা দেখাতে পাল্লুম, ওত প্রকৃতিরই হাতে পড়ে তারই খেলান খেলা খেললুম মাত্র। উইপোকা যে গড়েচে বুঝে দেখতে গেলে উইঢিপি তারই গড়া। ক্ষুদ্র পোকাগুলা মুখে করে মাটী বয়ে এনে সাজিয়েচে বলেই তার মধ্যে সত্যই তার এমন বাহাদুরী কিছু নেই। যে তারে গড়েচে সে অমনি করেই গড়েচে যে বেচারি মাটী বইবেই। মর্ত্তে মর্ত্তেও বইবেই।

আমাদের ভারতের সত্য এমন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে মনকে সচেতন করে সত্যকার প্রাধান্য এনে দেয় যে, আমরা এইটে বুঝি বুঝে জেগে জেগেই জগৎ প্রপঞ্চের স্বপ্ন দেখি। ঠিক প্রকৃতির হাতে খেলব না, প্রকৃতিকে যিনি খেলাচ্চেন তাঁরই হাতে খেলব এইটে হল আমাদের জীবন প্রকাশে পার্থক্য। তাই আমরাও এই বিশ্বে অপর সকল জাতির মতই জীবনের খেলাই খেলে এসেছি,—তারা সমাজ স্থাপনা করেচে সভ্যতা স্থাপনা করেচে শিল্প বাণিজ্য নিয়ে আড়ম্বর করেচে, আমরাও করেচি। তারাও যুদ্ধ করেচে শান্তি এনেচে ধর্ম্মপ্রচার করেচে, আমরাও করেচি। তাদের ব্যষ্টি জীবন পারিবারিক জীবন সুখ সম্পদ সাহিত্য সঙ্গীত বিলাস—আমাদেরও বাদ যায় নি। সবই আমাদের মত হয়েচে কিন্তু তাদের যেমন করে হয় আমাদের তেমন করে হয় নি। আমাদের পার্থক্য আছে। আমাদের মত তারা প্রকৃতিকে যিনি চালাচ্চেন তারই হাতে

চলবার চেষ্টা করে নি। প্রকৃতি যেমন চালিয়েচে সহজ ভাবে তেমনই একরোখা চলে আসচে।

সাদাসিদে দেখলে ওদেরই যেন কত উন্নত স্বচ্ছন্দ ভাব যেন ওইটেতেই শক্তির বেশী স্ফুরণ, যেন আমাদের পথটা কুটীল, জাড্য আর অকর্ম্মণ্যতায় ভরা।

কিন্তু ভাল করে দেখতে গেলে তাতো নয়। আমরা স্রোতের বিপরীত মুখে চলেছি ওরা চলেচে অনুকুলে। ওরা যাচ্চে ভেসে আমরা যাচ্চি ঠেলে। আমরা একদিকে নদীর উৎপত্তি স্থানের সন্ধান নিচ্চি ওরা ওই নদীরই জোয়ার ভাটায় এক্‌বার নামচে একবার উঠচে। সাদা চোখে দেখাচ্চে বটে ওরা হুহু করে ভেসে চলেচে—আমরা যাচ্চি ঢিমে তালে। কিন্তু ওরা যাচ্চে যাচ্চেই, কোথাও ত যাচ্চে না, আমাদের ত তা নয়। আমরা যে টুকু যাচ্চি—সে যত টুকুই হোক্ পথ কমিয়ে যে ফেলচি।

প্রত্যেক জাতির মূলে এক একটা ভাব আছে বলেচি সেইটে তার সত্য। হিন্দুর মূলে যেটা ভাব বলে ধরে নেওয়া গেছে অন্যজাতির ভাব থাকার তুলনায় সে এক নয়। সকল জাতির ভাব এক একটা স্বতন্ত্র ভাব, আর হিন্দুর ভাব হচ্ছে- সকল ভাব সমন্বয়ের ভাব। ইংরাজের ভাব স্বার্থ ফরাসীর ভাব স্বাধীনতা মার্কিণের ভাব সাম্য জার্ম্মানের ভাব প্রাধান্য। জাতিগুলা দানা বাঁধবার দিন থেকে এই এক একটা ভাব নিয়েই আছে, থাকবে, যে দিন পর্য্যন্ত না ধ্বংস শতচূর্ণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়চে তারা আপন আপন ভাবেই অটুট কিন্তু দেখ ওই দোয়ারে ওঠা আর নামা—উন্নতি আয় অবনতি—দিনকতক বড় মানুষী আবার তারপর গরিবীয়ানা, এই নিয়েই ওই মূল ভাব ধরে তারা পড়ে আছে। ও ভাবটার কোনও লক্ষ্য নেই কোনও গতি নেই। ভাবটার এতটুকুও ওদের পরিণতি নেই চোখের ওপর যে হাউই বাজি দেখব সে ওই উন্নতিরই, বড় মানুষের রঙ বেরঙের আগুনের ফিন্‌কি. কাটতে কাটতে সর্ সর্ শূন্যে ঠেলে ওঠা আর ধুপ্ করে পড়া। ইতিহাস খুলে পড় এ ছাড়া আর কিছু দেখবে না।

তার উপর ওই যে স্বার্থ স্বাধীনতা সাম্য প্রাধান্য বড় বড় কথা গুলো দেখচ—ওর মূলগত যে ভাব সে ওদের একার নয় জেনো, ভারতের সমন্বয় ভাবের ভিতর সকলকেই: খুঁজে পাবে। ভারত ও সবগুলোকেই তার তপস্যার গণ্ডী মধ্যে টেনে এনে—মহা সমন্বয়ের চেষ্টা করচে। সে ভবিষ্যৎ জগতের জন্য একমনে একটা কিছু গড়চে, উন্নতির খেয়ালই রাখে নি। অমন কত উন্নতির

হাউই তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে সে ফিরে তাকায়নি। সমস্তের ভাবকে এক করে একটা মহাসমন্বয় গড়াই যে তার লক্ষ্য। পৃথিবী তাকে আপনার উন্নতি দেখিয়ে বার বার উপহাস করে গেছে, কখনও কুন্ঠিত কর্ত্তে পারে নি।

ওই যে চারটে মূল ভাব—ধর্ম্ম অর্থ কাম আর তাদের লক্ষ্য স্বরূপ মোক্ষ, জগতের সকল দেশের সকল ভাবই এর মধ্যে পাবে। প্রথম ওই তিনটে ভাব ছাড়া মানুষের জীবন রচনা হতেই পারে না আর চতুর্থ ভাবটী আদর্শ স্বরূপ না থাকলে কোনও ভাবই স্বভাবে কোনও দিন থাকে না ঘুলিয়ে উঠে। ভারত শূদ্রের মধ্যে কাম, বৈশ্যের মধ্যে অর্থের ভাব ঢুকিয়েছিল। আর ক্ষত্রিয় গড়েছিল, তার কাজ ছিল প্রকৃতির জড় শক্তির প্রবাহে যেন ওই দুই জড়ের মধ্যে সমাপ্ত বর্ণ ভেসে না যায়। ক্ষত্রিয়ের তাই ভাব ছিল ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের কাজ হচ্ছে অমৃতের অমর সত্ত্বায় উদ্বোধিত অন্তর্মুখী শক্তির অনিবার্য্য স্ফুরণে বাহ্য বলের বিপুল প্রকাশ। তার উপর ছিল ব্রাহ্মণ, যে ঐ জীবনাতীতকে জীবনের সকল দ্বারে বিঘোষিত করে মোক্ষের আদর্শ দিয়ে ধর্ম্ম অর্থ কামকে সংযত রাখত—ভারতের বৈশিষ্টের অভিমুখী করতো।

এই ত constitition; এখন হিন্দুজাতি ধর্ম্মের বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলতে কি বুঝব? বুঝব কি ওই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, না বৈশ্যের অর্থ, না শূদ্রের কাম, না বুঝব ব্রাহ্মণের মোক্ষ?—কোন বনিয়াদের উপর হিন্দুজাতি প্রতিষ্ঠিত বুঝব?

বোঝার কথা বলতে গেলে বলতে হয় এখনও চরম বোঝা ভারতের শেষ হয়নি। এখনও সে বুঝচে। যে জিনিষ তার মধ্যে রচিত হয়ে উঠলে সে আর আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকতে পার্ব্বে না, পাকা ফল যেমন করে বৃন্তচ্যুত হয় তেমনি করে তার অন্তরাত্মা আপনার জন্মভূমি ছেড়ে বিশ্বের অভিমুখে যাবেই, সে বোঝা এখনও হয়ে ওঠেনি। সে বোঝা যেদিন পঞ্চনদে যজ্ঞকুণ্ডের চতুর্দ্দিক ঘিরে ঋষিগণ আপনাপন স্ত্রীপুত্র পরিবার সঙ্গে করে আহুতি দিতেন সে দিন যেমন করে চলছিল,—যে দিন তথাগত গৌতম জন্ম ব্যাধি জরা মৃত্যু পীড়িত সংসারের উপর আপনার বোধিসত্ব লব্ধ জীবনের বাণী ছড়িয়ে দিলেন সে দিন যেমন করে চলছিল,—যেদিন চূর্ণীকৃত বৌদ্ধমঠের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুর তরবারি ও নব প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসের হর হর ব্যোম ব্যোম নাদ দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ করেছিল সে দিন যেমন করে চলছিল,—যেদিন ইসলামের দীন্ দীন্ রবত্রস্ত পরাজিত ব্রাহ্মণত্ব গ্রাম্য সমাজে বিবাহাদি অনুষ্ঠান মাত্র সম্বল করে আত্মগোপন

দ্বারা আপনার প্রাণ রক্ষা করেছিল সেদিন যেমন করে চলছিল,—আজও এই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ভগ্ননৈতিক-মেরুদণ্ড জাতির সম্মুখে ধ্বংসের বিকট ব্যাদান দেখে হিন্দু মুসলমান শিখ জৈন সব একত্রিত হয়ে এই আর্ত্তনাদ এই কম্পনের মধ্যে তেমনি করেই চলচে। বোঝা তেমনি করেই চলচে। সেটা অতীত বলে কোনও মহামহিমার্ণব ভগবানের রাজত্ব ছিল না। এটা বর্ত্তমান বলে আর একটা জরাজীর্ণ শীর্ণ কুব্জ অভিশাপগ্রস্ত ভগবান এ যুগের অধীশ্বর হয়ে বসেন নি। সেই একই ভগবান, এ মানুষও এক। প্রভেদ যা সে ক্রমঃপরিবর্ত্তিত অবস্থার।

বিশ্বের চতুর্দ্দিকে অপরাপর দেশগুলায় মানুষ কেউ ধর্ম্ম কেউ অর্থ কেউ কাম এই ভাবেরই একটীকে প্রবল করে তারি ওপর আপনাপন জাতির বিশিষ্ট সুর চড়িয়ে একটা একটা আদর্শ রচনা করে। ঐ পর্য্যন্তই তাদের চেতনা। বাকিটা সমস্তই প্রকৃতির দুর্দ্দাম অভিব্যক্তি। সেই অভিব্যক্তি থাকে উপরে, চেতনা তার প্লাবনের নীচে কোথায় তলিয়ে যায়, তাই কেউ স্বার্থ অমন প্রবল সপ্রগলভতার বজায় কর্ত্তে পারে, কেউ নররক্তে পৃথিবী ধৌত করেও আপন প্রাধান্য বজায় করে চলে যায়। কেউ বা আপনার ধর্ম্ম কেউ বা আপনার রাষ্ট্রনীতি কেউবা আপনার সভ্যতা বিকট বক্তৃবং বিস্তার করে অপর জাতিগুলিকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পৃথিবীর ভূধর গণে, কান্তার চষে সমভূমি করে বেড়ায়। প্রকৃতির যতখানি জোর ঝঞ্ঝায় বজ্রে সাগরোচ্ছ্বাসে বিস্ফারিত এদের এক একজনের এক একটী দাপট তার চেয়ে কম জোরে ত পাখশাট মারে না।

এখানে ভারতে ওমনি একটা ভাবকে প্রকৃতির জড়বেগের কুণ্ডলীকৃত স্তম্ভের মাঝখানে ফেলে ভগবান কখনও শক্তির আবর্ত্ত রচনা করেন নি। এখানে যা হচ্চে, সে বরাবরই বলে আসছি একেবারে স্বতন্ত্র ব্যাপার।

মোক্ষের ভিত্তির ওপর, ধর্ম্ম অর্থ কাম, আপন আপন সামঞ্জস্য রেখে একটী ভাবসমন্বয়মূলক চেতনা রচনা করচে এখানে। সেই চেতনা প্রকৃতির প্লাবনের নীচে তলিয়ে যাবে না, তার ওপরে উঠেই আমরা যেমন আমাদের কলকব্জার মধ্যে প্রকৃতির একটু আধটু বাষ্পশক্তি বা বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগাই তেমনি করে সমগ্র প্রকৃতির অফুরন্ত শক্তি ভাণ্ডারকে কাজে লাগাবে। মানবত্বের একটা মহৎ পরিণামই ভারত ধীরে ধীরে আপনার উত্থানে পতনে সুখে দুঃখে এই পুণ্যভূমিতে রচনা করে যাচ্চে।

অতএব বলতে অবশ্যই পারি যে কোন বনিয়াদের ওপর হিন্দুর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত সে ত এখনও আমি বুঝে উঠিনি। হিন্দুর সমস্তটা এখনও গড়ে ওঠে নি যে। আমি কেবল বললুম মাত্র যে হিন্দুর এইটিই বনিয়াদ। ভারতের মেরুদণ্ড ধর্ম্ম কিন্তু সে মেরুদণ্ড শরীরতত্ত্বের বাইরের জিনিষ। ভারতবর্ষের দেহটাকে কেটে খান খান করেও তাকে তুমি চক্ষের উপর তুলে ধর্ত্তে পার্ব্বে না।

ভারতের ধর্ম্ম হচ্চে মোক্ষ ধর্ম্ম অর্থ কামের সামঞ্জস্য, তা যদি না হবে তাহলে ত বৈদিক যুগেই জাতির সমাপ্তি ঘটে যেত। একটা মূর্ত্তি নিয়ে যেমন ইসলাম ধধূপের জ্বালাময় উদগারসম ছুটে বেরিয়ে আপনার সমস্ত আলোটা জ্বালিয়ে আপনাকে পুড়িয়ে ফেলেছিল, স্পেন বেরিয়েছিল, দীনেমার বেরিয়েছিল, ইংরাজ বেরিয়েছে, জার্ম্মাণ রুষ বেরুচ্চে,—তেমনি করে সে যুগে ভারতও বেরুত। তার সেই গগনস্পর্শী যজ্ঞধূম কত কত বিভিন্ন জাতির ছিন্ন শির আহুতি স্পর্শে বিকট গন্ধসহ গগনমার্গে কুণ্ডলীকৃত হত কে তা বলতে পারে? তার সামগানের ছন্দে কত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির সঙ্গে যুদ্ধের গাথা কীর্ত্তিত হয়ে যেত। তা ত হল না। বরং উল্টে ভারত একদিন কোন এক নব স্বপ্ন দেখে আপন মনে আপনিই শিহরিয়া উঠ্‌ল। সে আপনার মধ্যেই ভেঙ্গে গড়া সুরু করে দিলে। ধর্ম্মের যে আদর্শ একটু একটু করে তৈরী হয়ে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছিল, তাকে সে বদলে দিলে। সে নব অনুষ্ঠানে নূতন করে ফিরে বসল। ভারতে বৌদ্ধ সাধনার ভিতর দিয়ে মোক্ষের আদর্শটাকে সম্মুখে রেখে মোক্ষকে প্রাধান্য দিয়ে নবীন জীবন রচনা আরম্ভ হল। সমাজ বদলে গেল, সভ্যতা বদলে গেল, আচার বিচার বসন ভূষণ জীবন ধারণ সবই ভারত নূতন করে নিয়ে আপনাকে আবার ঢেলে সাজলে। এ যুগে যে জিনিষ তৈরী হয়ে উঠেচে সেও ত সামান্য নয়। তারে দেখে বিশাল চীন সম্ভ্রমে মাথা নীচু করেচে, পারস্য অভিভূত হয়ে গিয়েচে, জগতের শত শত জাতি সংস্পর্শ লাভ করে আপনাকে ধন্য কর্ত্তে ছুটে এসেচে কিন্তু ভারতের গণ্ডী সেখানেও পড়েনি,—তারে যে তখনো এগোতে হবে। হ'ক না পথ সঙ্কটময়; সে অত্যুজ্জ্বল রবিকরোদ্ভাসিত শৃঙ্গ থেকে উপত্যকা তার পর আরো নীচু একেবারে গভীর খাতের মধ্য দিয়ে না হয় তার পথ গিয়েছে; তাই বলে কি তাকে থেমে যেতে হবে? তাই ভারত সেখানেও চুপ কর্ত্তে পারে নি। ধর্ম্মবিরোধ আত্মসঙ্কোচ পরাজয় অপমান সমস্তের মধ্য দিয়ে ভারত একেবারে মৃত্যুমুখেও এসে দাঁড়াতে দ্বিধা করে নি।

ভারতের নিজস্ব জীবন ধারা অন্তঃসলিলা হয়ে ঠিকই বয়ে আসচে। মুসলমান আমলে ঐ গোঁড়ামীর ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিতে দেখেই তারে উৎসন্নে গেছে ভেবো না, ইংরাজ আসলে এই যে গোলামীর গাধার টুপি পরে সেই ভারত—সেই যাজ্ঞিক ভারত—সেই মুমুক্ষু বুদ্ধ ভারত—এমন সঙের মত ধেই ধেই করে নাচচে,—এ দেখে নিরাশ হয়ো না।

যে ভগবান এরে ধর্ম্মের আদর্শ মোক্ষের আদর্শ যুগের মধ্যে দাঁড় করিয়ে ছিলেন; এখনও তিনিই আছেন—তাঁরই হাতে এর ভাগ্যরজ্জু। ইচ্ছার অনিরুদ্ধ বেগ নিয়ন্ত্রিত বলধর্ম্মী মুসলমান আর স্বার্থ সর্ব্বস্ব পরম নাস্তিক ইংরাজ আজ তাঁরই বিধানে ভারতের প্রবাহের মধ্যে পড়েচে। ঐ চতুর্ব্বর্গের সামঞ্জস্যে এরাও আপন আপন দান দিতে এসেচে,—এরা কেউ ছোট নয়। আপন কাজ সমাপ্ত হলে সকলেই ভারতের আপন হয়ে যাবে।

এই শেষ লক্ষ্যের মধ্যে পৌঁছান পর্য্যন্ত ভারতের জাতির গঠনই চলবে। তারপরই ভারতবর্ষ দাঁড়াবে, যে দাঁড়ানকে প্রকৃত নিজের পায়ের ওপর দাঁড়ান বলে।

বিশ্ববিদ্যালয় বিদায়-গীতি

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়।]

আমার স্কন্ধে মন্দমতি
চাপ্‌ল দুষ্ট সরস্বতী
বিদায় নিলাম বিদ্যাসতী
তোমার আলয় থেকে
এতদিনের ভালবাসা
মিটলনাক প্রাণের তৃষা
মরীচিকায় ভোলায় দিশা
স্বপন-মায়া ডেকে।

চাইলে চোখে লাগে ধাঁধা
মুদ্‌লে আঁখি সবই আঁধা
ভাবতে গিয়ে দেখি—গাধা
কথায় আছে ডাক!
নামিয়ে দিয়ে ভূতের বোঝা
এবার আমি হ'লাম সোজা
রইল আমার 'ডিগ্রী' খোঁজা
'নোটের' ঘানিপাক।
তোমার কৃপা-দৃষ্টি পেলে
লক্ষ্মী সে তো পায়ে ঠেলে
সরস্বতী দূরে ফেলে
ত্যজ্যপুত্র করে।
শরীর—সে তো নাকের আগায়
দৃষ্টি—সে তো চশ্‌মা লাগায়
জীবন—সে তো শ্মশান জাগায়
জ্যান্ত শবের পরে!
তোমার কোলে যে সব ছেলে
নন্দদুলাল শরীর মেলে
জীবনটা তো অবহেলে
কাটিয়ে দিল খাসা
ভুঁড়ি, দাড়ি, চেন ঝুলিয়ে
প্রথম দুটোয় হাত বুলিয়ে
জ্ঞান-সাগরের জল ঘুলিয়ে
তুল্‌ছে বালির থাসা
তাদের মতন্ হয় বা কজন্?
লাখের মধ্যে দু এক ডজন—
মেখে পায়ে কৃপার রজন্
ভাগ্য-দোলায় নাচে
পিটিয়ে গাধা বানান্ ঘোড়া—
পূজ্‌তে তাঁদের চরণ-জোড়া

নিয়ে মোটা টাকার তোড়া
অনেক ছেলেই আছে।
বাক্‌সে তাদের আছে যে দম্‌,
শরীরেই তা' বিশেষ কি কম!
তাইতে তারা হয়না বেদম্‌
বিষ্ঠা-রেসে ছুটে;
চক্ষু মুদে ঊর্দ্ধশ্বাসে
ছুটছে তারা জয়ের আশে
দেখেই বিদ্যা পলান ত্রাসে
ভাবেন ধরল ক্ষুতে!

কিন্তু যাঁদের বাক্‌স শূন্য
নাইক খোসামোদের পুণ্য
কিম্বা কর্ম্ম দোষের জন্য
ধনের ঘড়া খালি।
তা'রাও কেন মোহের ভরে
ঋণের বোঝা মাথায় করে'
বিষ্ঠা বলে' অবিষ্ঠারে
দিচ্ছে পূজার ডালি।

দরিদ্রতার তাইতো জ্বালা
তাইতো গলে দুখের মালা,
তাইতো যখন হাসির পালা
অশ্রু চোখে ক্ষরে।

ফুলের মত জীবন-শত
আধেক-ফোটা ফুলেরমত
মধ্য-দিবস না হয় গত
অকালে যায় ঝরে'!

বুঝে শুঝে বোঝার দায়
এড়িয়ে এবার—স্বস্থ-কায়ে
ভাসিয়ে দিলাম জীবন নাক্ষ
অথই সাগর-বুকে।

নিজের হাতে ধরেছি হাল
নিজের হাতে তুলেছি পাল
চক্ষু চেয়ে সকাল বিকাল
বাইব তা'রে সুখে।

যেমন সহজ সূর্য্য উঠে
যেমন সহজ কুসুম ফুটে
যেমন সহজ গন্ধ ছুটে
হাওয়ার বুকে ভেসে,
তেমনি করে' বাঁধন টুটে
পরাণ আমার উঠবে ফুটে
হাওয়ার সনে ছুটে ছুটে
চলব দেশে দেশে।

প্রাণের কথা আপন ভুলে
গাইব নিতি পরাণ খুলে
বিশ্ব চিত্ত উঠবে দুলে
আপন ভোলা সুরে।

অন্ধ আঁধার খুলবে নয়ন
করবে আলোর কুসুম-চয়ন
মরণ হ'বে কুসুম-শয়ন
জীবন-মোহন পুরে।

——

চিঠির গুচ্ছ

দুই দফা

(৪)

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।]

(ইংরাজী চিঠির অনুবাদ)

প্রিয়তমে নীহার,

সত্যিই ভাই অধ্যাপক সম্বন্ধে আমার বড়ই বিদ্‌ঘুটে একটা ধারণা আছে। শুনে নিশ্চিন্ত হলুম যে তোমার স্বামী সুপুরুষ এবং রসিক লোক।

আমি ভাই, খুবই লজ্জিত যে আমাদের মাঝে এমন সব মেয়ে আছে, যারা তোমাদের ঘৃণা করে শুধু তোমাদের রং কালো আর তোমাদের আচর ব্যবহার ভিন্ন ধরণের দেখে। নতুনকে যারা সইতে পারে না, আমার মতে, দুনিয়ার আনন্দ তারা উপভোগ করতে অক্ষম। অতি ছোট বয়সেই আমি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে এসেচি এবং তারপর আর সেখানে ফিরে যাবার সৌভাগ্য কথনো আমার হয়নি; কাজেই সেখানকার মেয়েরা কেমন, তা আমি ঠিক বলতে পারিনে। তবে পুঁথি পত্রে তাদের পরিচয় যা পেয়েছি, তাতে মনে হয়, ভারতে পালিতা ইংরাজ-দুহিতার মত তারা সঙ্কীর্ণ চেতা নয়—দুনিয়াকে তারা দেখতে চায় পূর্ণরূপে, আর, নূতনকে বরণ করে নিতে সর্ব্বদাই তারা প্রস্তুত।

তুমি বিয়ে করেছ বলে আমি মোটেও আশ্চর্য্যান্বিত হইনি—আর স্বামীকে ইতিমধ্যে ভালবেসে ফেলেছ বলে তোমায় জানোয়ার ঠাউরে বসিনি।

আমি শুধু ভাবি, তোমরা এমন কি এক আশ্চর্য্য উপাদানে গঠিত, যার জন্য, এত অল্প বয়সে তোমরা জীবনের চাঞ্চল্য বর্জ্জন করতে পার। তোমাদের জীবনে কর্ত্তব্যের দাবীটা আমাদের কাছে বড়ই বিচিত্র বলে মনে হয়। জীবনের কত কিছু হতে নিজেদের বঞ্চিত রেখে বেস প্রফুল্ল চিত্তে পার তোমরা নিজেদের বিলিয়ে দিতে।

এর মাঝে নিশ্চতই তোমরা একটা আনন্দ পাও, নইলে এ নিয়ম কিছুতেই চলত না। তোমার সমাজের বন্ধন নিশ্চয়ই খসে যেত; যদি তোমরা এতে ব্যথা পেতে। এই রকম কোটি কোটি নারী নিয়েইত তোমাদের জাতি গড়া —অভিযোগ কেউত করে না।

তোমরা যারা, নতুন ভাবকে গ্রহণ করতে পেরেচ, কেবল তারাই বেদনা অনুভব করচ এবং সেই ব্যথা বুকে চেপে না রেখে প্রতিকার প্রার্থনা করচ। তোমাদের সমাজে রক্ষণশীল যাঁরা, তাঁরা এতেই চঞ্চল হয়ে উঠেচেন এবং আমাদের দেশের শিক্ষা ও সভ্যতার নিন্দা করে, তোমাদের সতর্ক করে দিচ্চেন, তোমরা যেন ওই ভূয়ো সভ্যতার বাইরের আবরণ দেখে মুগ্ধ না হও। এ সব কথা আমি তোমার কাছেই শুনেচি—কাজেই এত সভ্যতা সম্বন্ধে আমার চাইতে তুমিই ভালো জান।

এ সব সদি সত্য না হয়, তা হলে তোমাদের দেশের নারী জীবন ইচ্ছামত তোমরা গঠন করতে পারবে—কিন্তু যদি সত্য হয় তা হলে তোমাদের খুবই বেগ পেতে হবে।

জীবনের আদর্শটাকে যদি তোমরা খুব ছোট করে নেও, আর ছোট্ট সেই আদর্শ লাভ করেই তোমরা যদি তৃপ্ত থাক, তা হলে তোমাদের নিজেদের ভিতরই যে পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবেনা। তোমরাত স্বভাবতই মনে করবে যে অবস্থায় তোমরা আছ, তার চাইতে ভাল ব্যবস্থা কিছু হতেই পারে না।

পরিবর্ত্তন যাঁরা পছন্দ করেন না, তাঁরা তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে চরম সুখের ও শান্তির অবস্থা বলে মনে করে নিয়েছেন এবং পরিবর্ত্তনের জন্য যাঁরা আন্দোলন কর্‌চেন, তাদের বলচেন দেশের মেয়েদের চিত্তে মিথ্যে অভাব তুলে তাদের জীবনে অশান্তি এনে দিয়ো না।

শান্তির মূল্যস্বরূপ তোমরা অনেক কিছুই দিতে পার, দেখচি। এমন কি এই শান্তির জন্য তোমরা মরতেও পিছুপাও নও। আমার মনে হয়, জীবনের পক্ষে তোমাদের প্রার্থিত এই ধরণের শান্তির চাইতে সংগ্রামেরই বেশি প্রয়োজন।

শান্তির জড়তায় যদি জীবন আড়ষ্ট হয়ে যায়, অথবা প্রাণের স্পন্দনকেই যদি শান্তির বিঘ্নস্বরূপ বলে মনে কর, তা হলে, কাণাকড়ি মূল্যেও আমি সে শান্তি ক্রয় করতে রাজী নই।

মানুষ শান্তি চায় কেন? জীবনকে উপভোগ করবার জন্যই ত। তোমাদের ওই ঘরের কোণের বদ্ধ-জীবন কি উপভোগ্য হতে পারে? অবশ্য যা করতে হবেই, না করে উপায় নেই, সে কাজটাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলে, তা দুঃখের বোঝা হয়ে ওঠে না—সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যই মেয়েদের

ঘরের কাজ প্রভৃতি কর্ত্তব্যগুলিকে আনন্দপূর্ণ বলে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই গৃহ-কর্ম্ম প্রভৃতির পরেই সহসা তোমরা একটা বড় দাড়ি টেনে দিয়েচ—আর, সেইটেই হচ্চে তোমাদের জীবনের পক্ষে মারাত্মক।

আমাদের সমাজের মেয়েদের কি ঘরের কাজ করতে হয় না? ব্রিটিশ-সন্তানেরা কি মাতৃস্নেহের মধুর স্বাদ পায় না? দম্পতী পায় না একে অন্যের ভালবাসা? এ-সব যদি না পেত, তাহলে শুধু কামানের আর বন্দুকের জোরেই এত বড় জাতি গড়ে উঠতে পারত না—এ জাতির মানুষ শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে যেত, অথবা মৃতপ্রায় হয়ে আটল্যাণ্টিকের ওই ক্ষুদ্র দ্বীপটির ধুলোর ওপরই লুটিয়ে পড়ে থাকত।

জীবনকে উপভোগ্য করতে হলে, তার পরিসরও বৃহত্তর করতে হবে। যাতে করে এক জায়গায় বেদনা পেয়ে, অন্যত্র লব্ধ আনন্দের উল্লাসে সেই বুকের ব্যথা ঘুচান যায়।

সাংসারিক অপরিহার্য্য দুঃখ-দৈন্য যখন কেবলই পীড়ন করে, মানুষ যদি তখন এমন একটা যায়গা না পায়, যেখানে দাঁড়িয়ে সে এতটুকু আনন্দ লাভ করতে পারে, তা হ'লে বেদনার আঘাতে সে ত ভেঙে পড়বেই—তার জীবন একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

নারীকে কেবলমাত্র গৃহের ঘরণী করে রেখে তোমাদের সমাজ নারীজীবন একেবারে বিফল করে দিয়েচে। এই বিরাট বিশ্বে প্রাচীরবেষ্টিত ওই ক্ষুদ্র আঙিনাটুকু ব্যতীত কোথাও তাদের দাঁড়াবার স্থানটিও নেই। তোমার সমাজের পুরুষ যখন অত্যাচারের অনুষ্ঠান করে, তখন ঐ আবদ্ধ স্থানটুকুর মাঝে পড়েই তাকে যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করতে হয়!

তবুও যে তারা অভিযোগ করে না, তার কারণ হচ্চে এই যে, তারা বোঝে না প্রচলিত প্রথার চাইতে ভাল কিছু থাকা সম্ভব, যা তাদের জীবনকে বেশি কিছু আনন্দ দিতে পারে।

তোমাদের জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের সমাজ, সম্মোহনমন্ত্র আউড়ে তোমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, তোমরা ছোট, শক্তিহীন, পুরুষের দাসী। তাই ভিক্ষাস্বরূপ যতটুকু পাও, তাতেই তৃপ্ত হয়ে থাক; আর সেই অবস্থাটাকেই স্বাভাবিক বোলে মনে কর।

তুমি ঠিক বলেচ যে, বাইরের আন্দোলনে কিছু হবে না—নারীর অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে মুক্ত হবার, পূর্ণ হবারই একটা আকাঙ্ক্ষা। কোন বিষয়েরই

অধিকার ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না—নিজের চেষ্টায়, নিজেরই শক্তির জোরে সব আদায় করে নিতে হয়। তোমাদের পুরুষেরা তোমাদের কোন অধিকার দেবে কি দেবে না, তা আমি জানিনে। যদি দিতে চায় ত কাজ সহজ হয়েই যাবে। আর দিতে না চাইলেই কি তোমরা চুপটি করে বসে থাকবে? দুনিয়ার ওপর দাবীটা কি শুধু তাদেরই—তোমাদের কিছুই নাই? আমি একথা কখনো ভাবতে পারিনে যে কেবল পুরুষদের নিয়েই একটা জাতি গড়ে উঠতে পারে। জাতিগঠন ব্যাপারে নারীর দান কি অগ্রাহ্য করা চলে?

তুমি লিখেচ যে, ভাঙ্গতে তোমার বড় ব্যথা লাগে। কিন্তু, সেই ব্যথার ভয়ে চুপ করে থাকলে ত চলবে না। দেহে ফোঁড়া হলে, সে ফোঁড়া কাটতে হবে, চিরতে হবে।—ব্যথা পাবার ভয়ে তাকে বাড়তে দিলে তোমার জীবন নিয়েই শেষটায় টানাটানি পড়ে যাবে। ফোঁড়া কাটবার বেলায় ডাক্তার নির্ম্মম ব্যবস্থাই করে থাকে—তখন রয়ে সয়ে কাজ করলে তার চলে না। রোগী যখন সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে, ডাক্তার তখনই মায়ের মত স্নেহ ও যত্ন নিয়ে তার সেবা করে।

যুগান্ত-সঞ্চিত যে অনিয়ম সমাজদেহ সহস্র-বন্ধনে বেঁধে রেখেচে, তার অবিচার হতে মানুষকে মুক্ত করতে হলে নির্ম্মমই হওয়া চাই। ভাঙবার চেষ্টা তখনই নিন্দনীয়, গড়বার প্রবৃত্তির যখন অভাব হয়—কিন্তু গড়বারই জন্য যে ভাঙা, সে ত অনাবশ্যক নয়—সে অপরিহার্য্য।

জেনে খুসী হয়েচি যে, তোমার স্বামী উদারচেতা ও সংস্কার প্রয়াসী। তোমাদের দুজনের চেষ্টায় তোমাদের দেশের মেয়েদের মনের দাসত্ব অন্তত কিছু বিদুরিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

তোমার চিঠি পেলে আমার বড়ই আনন্দ হয়—তোমার কাছে চিঠি লিখেও খুব আরাম পাই। তোমাতে আমাতে পত্রব্যবহার কোন দিনই যেন বন্ধ না হয়। জীবনের গতি তোমার আর আমার মাঝে যদি সুমেরু আর কুমেরুর ব্যবধানও ঘটিয়ে তোলে, তবুও যে বন্ধুত্ব-সূত্রে আমরা একবার বাঁধা পড়েচি, তা যেন শিথিল হয়ে না যায়। অটুট বন্ধুত্ব চিরদিনই যেন আমাদের দুটি প্রাণ এক করে রাখে। কেমন রাজী ত?

তোমারই

এভি।

(৫)

ভাই মোহিত,

তোমার দুখানি চিঠিই পেয়েচি—দিচ্চি দিচ্চি করে জবাব দিতে দেরী হয়ে গেল। তুমি লিখেচ, পরিবারের লোকের দাবী-দাওয়া আমাদের দেশে বড়ই বেশি—যতদিন না ওর পরিমাণটা আমরা সবাই কমিয়ে ফেলতে পারচি, তত-দিন পর্য্যন্ত আমাদের ঘরের বিবাদ নিবারিত হচ্চে না। সংসারে কারু কাছে কিছু চেয়ে নিতে হবে না সকলেই প্রাপ্য যা তা স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেবে—কিছু না পেলেও কেউ রুষ্ট হবে না, এ রকম অবস্থাটা সত্যি মন্দ নয়। সে রকমটি হলে অনেক অ-প্রীতির বোঝা কমে যাবে তাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু তুমি কি পারকি তা? যেখানে আমাদের নিজেদের এতটুকু অসুবিধা হবে মনে করি, সেখানেই ত আমরা যেতে নারাজ। সকলের প্রাপ্য যা, তা তথনই দিতে কার্পণ্য করি, যথনই আমরা বুঝতে পারি যে, দান করতে গেলে আমাদের ক্ষতির সম্ভাবনা। এই লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশে প্রবৃত্ত হয়েই ত আমরা যত গোলযোগের সৃষ্টি করি—আমরা পেতে চাই অনেক কিছু, কিন্তু দেবার বেলায় কেবল শূন্য।

এটা যে আমাদের বাঙালীদেরই কেবল দোষ তা নয়। মানুষের অন্তরে সর্ব্বত্রই এই আকাঙ্ক্ষাটা প্রচ্ছন্ন রয়েচে। মানুষ যখন দেখলে যে নিজ নিজ সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে উজিয়ে উঠতে পারচেনা, তখনই সমাজগঠন সুরু হোল এবং সবাই কিছু কিছু দাবীর অংশ ছেড়ে দিল, আর একে অন্যকে কিছু দিতেও প্রতিশ্রুত হল। দেনা-পাওনা এমনি করেই দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের সাহায্যে জীবন চালিয়ে নেওয়া সহজ হবে মনে করে। মানুষকে সাধারণোপযোগী একটা কিছু নিয়ম সব সময়েই গড়ে নিতে হবে।

তুমি যদি বল যে, সময় এসেচে, যখন আমাদের এই দেনা-পাওনার দাবীটা কমিয়ে বা বাড়িয়ে অন্যরকম করে নিতে হবে, তাতে আমি অসম্মত হব না। জীবনের আদর্শ যে বদলে গেছে সেটা আমি অস্বীকার করতে পারিনে। কাজেই নবীন আদর্শ লাভের জন্য এই নতুন জীবনে অনেক কিছু বাদ দিতেও হবে আবার গ্রহণও করতে হবে। অর্থাৎ মানুষ অন্ধের মত গতানুগতিক না হয়ে বিচার বুদ্ধির প্রয়োগে আপনি জীবনের কর্ম্মপদ্ধতি আপনিই স্থির করে নেবে।

দাবী যখন তুমিও কর, আমিও করি,—তখন ও জিনিষটাকে ত মুখের

কথায় উড়িয়ে দিতে পারচি নে। গোল এই নিয়েই হচ্চে যে, আমরা যেটাকে দাবীর যোগ্য বিবেচনা করিনে, অন্যে সেইটেই চায়—আর তা আমরা সইতে পারি নে।

তুমি লিখেচ, যে দাবীর জোরে তোমার বউদি প্রভৃতি নীহারকে তোমার কাছে না পাঠিয়ে তাদের কাছে রেখে দিয়েচেন, সে অতি অন্যায় দাবী আমি অস্বীকার করিনে। তোমার মতে এখন পত্নীর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাটা খুবই স্বাভাবিক এবং এই মিলনের মস্ত বড় একটা সার্থকতাও আছে।

গৌরীদান করে যারা অভ্যস্ত তারা কিন্তু নব-বিহাহিত দম্পতীর মিলনটাকে আবশ্যকীয় বলে মনে করে না, প্রকৃতপক্ষে দেহের অথবা মনের আকর্ষণ তখন সহজেই উপেক্ষা করা যেত। আজ পরিপূর্ণ দেহ-মন নিয়েই যে বিবাহ বাসরে স্বামী স্ত্রীর পরিচয় হচ্চে—জানবার ও জানাবার অনেক কর্ম্মই যে এখন তাদের বুক ভরে জমে ওঠে। এখন স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করে রাখলে, তারা ত স্বভাবতই খুব ব্যথা পাবে।

কিন্তু তুমি ব্যথা পাচ্ছ বলেই কি অন্যকে আঘাত করবে। আজ যদি তুমি নীহারকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বল, তোমার অভিভাবকেরা পাঠিয়েই দেবেন—কিন্তু অসন্তুষ্ট হবেন, বৌদি হয়ত ব্যথাই পাবেন। সব সময় সঙ্গীন খাড়া করে সংসারে চলা যায় না—ব্যক্তিত্বকে কখনো কখনো চেপে রাখতে হয় এক সঙ্গে অনেকে থাকতে হলে। এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে পারিবারিক শান্তি ভঙ্গ করোনা।

তুমি অবশ্য বলবে, এই রকম সামান্য সামান্য ঘটনার বহুল সমাবেশই একসঙ্গে মিলে দারুণ অবিচারে মানুষকে পীড়ন করে; সুতরাং চোখের সামনে, মনের গোচরে, যখনই তার পরিচয় পাবে, তখনই তাকে নষ্ট করতে হবে। তোমার এ কথার কি জবাব দেব, তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারচিনে। ও রকম যাদের মনের ভাব তাদের আমি সাধারণ মানুষের বাইরে—তাই বলে কিন্তু নীচে নয়—স্থান দিতে চাই; আর অসাধারণ যারা হবে, তাদের জন্য কোন বিধি নিয়মই খাটবেনা। আপনাদের শক্তির জোরেই নিজ নিজ লক্ষ্যাভিমুখে ছুটে যাবে, কিছুই তাদের গতির ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না।

সমাজে যদি এই ধরণের অসাধারণ লোক ক্রমে বেড়েই চলে, তা হলে

শেষটায় তারাই সাধারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং এখন যাকে অবিচার অত্যাচার বলচি সে গুলি বিদূরিত হয়ে আবার নতুন রকমের অবিচার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হবে। এই রকম ততদিন হতে থাকবে যতদিন না মানুষ দেবত্ব লাভ করবে। অবশ্য, দেব সমাজে যে কেউ কারু ওপর অত্যাচার করে না, তা আমি হলফ করে বলতে পারিনে। ঠিক কোথায় গেলে সে মানুষকে এতটুকু উৎপীড়ন অত্যাচার সইতে হবে না তা' আমি কল্পনায়ও জানতে পারিনে।

সেই জন্যইত আমি চারিদিকের সব কিছু ভেঙে চুরে এগিয়ে যেতে চাইনে। অমঙ্গল মাত্রকেই পায়ে দলবার প্রবৃত্তি আমি রাখিনে কারণ, আমি জানি, সেখানেই যাব, ওসব ঘাড়ে চেপে বসবেই—যদি ধীর স্থির ভাবে অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিবর্ত্তিত করতে না পারি। আমি যে পরিবর্ত্তন আনতে চাই তাতে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হবেনা, তাতে সমস্ত বিষয়েরই একটা আগা-গোড়া সামঞ্জস্য থাকবে। সেই জন্যই কেবল আস্তিন গুটিয়ে চলবার ভাবটা আমার ভাল লাগে না—সবই রয়ে সয়ে করাই আমার অভিপ্রেত।

কিছুদিন হতে একটা কথা কেবলই আমার মনে হচ্চে এবং সে-টা তোমায় না জানিয়ে থাকতে পারচিনে। সে হচ্চে আমাদের নবজাগরণের কথা। আমাদের চিত্তে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েচে, যার ফলে আমরা নিজেদের ভিতর একটা দুর্দ্দমনীয় শক্তির বেগ অনুভব করচি এবং যা আমাদের কেবল সামনের দিকেই ছুটিয়ে নিতে চাইচে—তাতেই উত্তেজিত হয়ে হাতের মাথায় যখন যা কিছু পাচ্ছি, তাই নিয়েই আমরা টানাটানি সুরু করে দিয়েচি। কোথাও কিছু সামঞ্জস্য নেই—আগাগোড়া কেবলই অমিল।

শক্তি সু-নিয়োজিত না হলে, তার অপচয় অবশ্যম্ভাবি। অকাজে ব্যয়িত হ'লে অফুরন্ত যা নয়, তার অভাব ঘটবারই বেশি সম্ভাবনা আমার ভয় হয়, যে শক্তি আমাদের অন্তরে সঞ্চিত হয়েচে, তা তেমন ভাবে খরচ করে আমরা শেষটায় দেউলে হয়ে না যাই।

তুমি চাও সমাজের সংস্কার সাধন করতে নির্ম্মম শক্তি প্রয়োগে। তোমার এই বল প্রয়োগ নারীকে স্বাধিকার লাভে কতটা সহায়তা করে তাই একবার দেখা যাক। তুমি আঘাত করে যাদের বুকে ব্যথা দেবে, কেমন করে প্রত্যাশা করতে পার যে তারা তোমার কাজের সহায়তা করতে অগ্রসর হবে? রক্ষণশীল বলে যাদের তুমি নিন্দা পরিহাস করবে তারা স্বভাবতই ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণই করবে। এরূপ অবস্থায়

যে পরিবর্ত্তন আনবাঁর চেষ্টা তুমি করচ, সমাজের বহুসংখ্যক লোকের প্রতিকূল আচরণে তা অসম্ভব হয়ে উঠবে। ক্ষেপে উঠে তারা অমনিই যতটুকু দিতে চাইত, তাও দেবে না—বাংলার নারীরা যে তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই পড়ে থাকবে, অকারণে তোমার খানিকটা শক্তি ক্ষয় হবে।

অথচ, ধীরে ধীরে তুমি যদি স্থিরভাবে কাজ করতে থাক, তা'হলে হয়ত তোমার ঈপ্সিত সহজেই মিলবে, তোমার চেষ্টা সফল হবে।

আজ এই পর্য্যন্তই রইল। ভাল আছি। তোমাদের কুশল সংবাদ লিখো। কনক নীহারের চিঠি রীতিমতই পাচ্ছি ইতি—

তোমারই—নরেশ।

নিশ্চিন্ত।

(শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত)

তুমি গো আমায় করেছ পাগল,
হৃদয় দুয়ারে ভেঙেছ আগল,
বিনাশি সরমে
পশেছ মরমে
মোর;
তাই লাভ ও ক্ষতির হিসাব নিকাশ
হয়েছে ভোর।
আমার মাঝারে তোমার বিকাশ
আজ
করেছে সফল,
আমার সকল
কাজ;
জানি মোর কোন কাজ নাই
এবে আর,
উদাসীর মত আছি আমি তাই
নিশিদিন অনিবার।

ততো জয়মুদীরয়েৎ।

(ভাণ্ডারকর স্মৃতিগ্রন্থ হইতে ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভির অনুবাদ)

(অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম, এ)

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ"

মহাভারতে প্রত্যেক পর্ব্বের আরম্ভে এবং গ্রন্থশেষে (১৮শ পর্ব্ব, ২৩২) পাঠমাহাত্ম্য বর্ণনাকালে এই শ্লোকটি দেখিতে পাই। এই নমস্ক্রিয়াবাক্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সাধারণে ইহা শুধু পড়িয়াই যায় এবং কিছুমাত্র না ভাবিয়া কথাটা সাদাসিধাভাবে অনুবাদ করিয়া লয়। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদে প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয় এই প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন,—"নারায়ণকে, নরশ্রেষ্ঠ নরকে, এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করিবে।" চতুর্থ পাদের যে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহা কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ দেখাইয়াছেন—ততো ব্যাপ্তস্তয়ৈব সরস্বত্যা পরম-কারুণিকয়া জনবোধায়াবিষ্টো জয়ং 'জয়ো নামেতিহাসোঽয়ম্' ইতি বক্ষ্যমাণত্বাজ জয়সংজ্ঞম্ ভারতাখ্যম্ ইতিহাসম্ বা—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতম্ তথা
কার্ষ্ণ্যম্ বেদম্ পঞ্চমঞ্চ যন্মহাভারতং বিদুঃ
তথৈব বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শিবধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ
জয়েতি নাম তেষাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ
ইতি ভবিষ্যবচনাৎ পুরাণাদিকম্ বা—

'চতুর্ণাং পুরুষার্থানামপি হেতৌ জয়োঽস্ত্রিয়াম্' ইতি কোষাদন্যং বা পুরুষার্থ-প্রতিপাদকং গ্রন্থং শারীরকসূত্রভাষ্যাদিরূপম্ উদীরয়েৎ উচ্চারয়েৎ।

প্রকৃত টীকাকার নীলকণ্ঠ 'ততঃ' এই শব্দটির নিজস্ব একটা অর্থ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রতাপচন্দ্র ইহা ছাড়িয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহার প্রতিশব্দ, 'পরে', তাহার পর' অর্থাৎ এখানে ঐ ত্রিবিধ নমস্কারের পর নীলকণ্ঠ পূর্ব্ববর্ত্তী 'সরস্বতী' শব্দের সঙ্গে ইহা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করিয়া

দিতে চাহেন। তাঁহার ব্যাখ্যা—'সেই পরমকারুণিক সরস্বতীদেবীর প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া, আর 'জয়' শব্দের 'জয়লাভ' এই সাধারণ অর্থ না ধরিয়া তিনি বলেন, এখানে উহা স্বয়ং মহাভারতকেই বুঝাইতেছে। ইহার পক্ষে তিনি মহাভারতের শ্লোক স্পষ্ট উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে দুইবার আছে—ইহার জয় নাম দেওয়া হইল। (১।২৩০২ ; ১৮।১৯৪) এই সংজ্ঞা মহাকাব্যে 'বিদুলপুত্রানুশাসন' (৫।৪৬০৯) উপাখ্যানে প্রযুক্ত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ প্রমাণস্বরূপ ভবিষ্যপুরাণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ভবিষ্যপুরাণে শুধু মহাভারতকেই জয় নাম দেওয়া হয় নাই,—অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, বিষ্ণুধর্ম্ম ও শিবধর্ম্মকেও এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এক অভিধানে, জয়শব্দের অর্থ, "যাহা চারি পুরুষার্থের কারণ" ; এই অভিধানের বলে তিনি ব্যাসের দার্শনিক গ্রন্থ, শারীরক সূত্র, ও সেই সঙ্গে শঙ্করাদি প্রণীত তাহার টীকা,—সমস্তই 'জয়' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে চাহেন।

নীলকণ্ঠ যেন এখানে পাণ্ডিত্যের বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ; তিনি এখানে জয় শব্দের যে অর্থ দিয়াছেন তাহা শুধু অভিধানেই আবদ্ধ, কিম্বা, কাল্পনিক ; সাহিত্যে ও ভাষায় তাহার প্রয়োগ নাই। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিলে আধুনিক যুগের প্রতাপচন্দ্র রায় এবং পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা সঙ্গত। আমার বিশ্বাস, সংস্কৃতে এমন কোনও নির্ভরযোগ্য উদাহরণ নাই যে, 'উদীরয়তি' ক্রিয়া যাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে তাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বদ্ধ। পাঠকদিগকে অবশ্য একথা মনে করাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই যে 'উদীরয়তির' প্রকৃত অর্থ চালাইয়া দেওয়া, বায়ুতে ত্যাগ করা, নিক্ষেপ করা, এবং ইহা হইতে রূপক অর্থ, শব্দ উচ্চারণ করা। কিন্তু সেরূপস্থলে ক্রিয়ার সহিত এমন একটি পদ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা শব্দের ঠিক বোধটি আনিয়া দেয় ;—ন তাং (বাচম্) উদীরয়েৎ ; মনু, ২।১১৬ ; বাচম্ উদীরয়ন্, রামায়ণ ২।৫৭।৩ ; উদীরয়ামাসুঃ...আলোকশব্দম্, রঘু. ২।৯ ; মন্ত্রমুদীরয়ন্, যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৩৬।

নীলকণ্ঠের প্রস্তাবিত এই কষ্ট-কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়া পরে দেখা যাউক, আর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিনা যাহা অধিক সহজ ও অধিক সঙ্গত হইতে পারে। লোকে অনায়াসে এরূপ অনুবাদ করিতে পারে,—নারায়ণ, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নর, এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া (মানুষ) তবে জয়লাভ করিতে যায়। নর-নারায়ণ আর কৃষ্ণার্জ্জুন একই, একথা আমাদের

জানা আছে, কারণ ইহা মহাভারতে বহুবার বলা হইয়াছে—১।২১৮।৭৮৮৯, ১।২২৪।৪১৬১, ১।২২৮।৮৩০২ ; ৩।৪৭।১৮৮৮ ; ৫।৯৬।৩৪৯৬, ৫।১১১।৩৮২৪ ; ৭।১১।৪২২ ; ৭।৭৭।২৭০৭ ; ইত্যাদি। এই একত্ব স্বীকার করিলে আর একটি বাক্য মনে পড়ে, তাহা এই প্রাথমিক আশীর্ব্বাণীর মত সমগ্র গ্রন্থে ওতপ্রোতভাবে আছে, তাহা মহাভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষারূপে ভারতের অন্তরে আজিও বিরাজমান :—যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ১।২০৫।৭৫১৩ ; ৪।৬৮।২৫৩১ ; ৬।২১।৭৭১ ; ৬।২৩।৮২১ ইত্যাদি। 'যেখানে কৃষ্ণ সেখানে জয়। অনেক স্থানে এই বাক্য ইহার অনুরূপ আর একটি বাক্যে পূর্ণতালাভ করিয়াছে, "যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণঃ"...৬।২৩।৮২১ ; এই দুই বাক্য একত্র হইয়া হইল—যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মঃ যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ১৩।১৬৮।৭৭৪৬ ; যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়। অবশেষে 'যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ' এই বাক্যের উৎপত্তি হইল। এই আকারে বাক্যটি যেন বিশুদ্ধ নীতি শিক্ষা দিতেছে—ধর্ম্মের জয় হয়। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যায় মহাভারতের প্রধান অর্থ ই বাদ যায়। মহাভারত যে নীতিমূলক শিক্ষাগ্রন্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার কাব্যে ও নীতিতে ভারতের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানের চিহ্ন স্পষ্ট আছে ; হিন্দুজাতির অন্যান্য কৃতির ন্যায় এই মহাকাব্যও সমগ্র জাতির সমগ্র সম্প্রদায়ের। ইহার নাম পঞ্চমবেদ, লোকে ইহাকে পঞ্চমবেদ বলে, ব্রাহ্মণদের চতুর্ব্বেদের প্রাতিপাদ্য বিষয়, আর্য্য জীবন, পবিত্র জীবন ; আর মহাভারত এই চারিবেদের সমান আসন অধিকার করিয়া ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ জীবন শিক্ষা দেয়। ইহার অন্য নাম কার্ষ্ণ্যবেদ, কৃষ্ণের বেদ, কারণ ইহা ক্ষত্রিয়দের নিকট সিদ্ধিও মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়রূপে কৃষ্ণধর্ম্ম প্রচার করে। "জয়"—যুদ্ধে জয়লাভ—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সিদ্ধি ; ক্ষত্রিয়ের শরণ, ক্ষত্রিয়ের প্রণম্য—ক্ষত্রদেবতা কৃষ্ণ। "যেখানে কৃষ্ণ সেখানে জয়," কারণ "কৃষ্ণকে পাইলে সবই পাওয়া যায়।" "যতঃ কৃষ্ণস্ততঃ সর্ব্বে।" যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই ধর্ম্ম ; ক্ষত্রিয়ের এই ধর্ম্ম তাহাকে বলে,—"মরিলে স্বর্গে যাইবে, জয়ী হইলে মহীভোগ করিবে, সুতরাং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, আমরণ যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না জয়লাভ কর।" দুষ্টের দমন ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য এই ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের হস্তে শাসনদণ্ড অর্পণ করে। এই সকল নীতির বা মতের উদাহরণ ও পরিণতি—মহাভারত, এই সকল মত ভগবদ্গীতায় একত্র হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ভগবদ্গীতা অনুপম নাট্য, লোকে প্রায়ই বলে, মহাভারতে ইহা অসংলগ্নভাবে অনর্থক জুড়িয়া

দেওয়া হইয়াছে, মূলে আখ্যানবস্তুর সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে, সমস্ত গ্রন্থটির কেন্দ্রই হইতেছে এই ভগবদ্গীতা। নরনারায়ণ-রূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে অবতীর্ণ কৃষ্ণার্জ্জুন, প্রধান সঙ্কটের সময় ধ্যানমগ্ন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, বীরধর্ম্মের শ্রেষ্ঠগুরু আনন্দময় ভগবানের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ; আর ভগবান্ তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন, বিশ্ববিধান মতে তাঁহার স্বধর্ম্ম, নিজের ধর্ম্ম নিঃসঙ্কোচে পালন করিতে ; শুভ যাহা, সাধু যাহা, তাহার জন্য আবশ্যক হইলে ইতস্ততঃ না করিয়া আত্মীয়দের রক্তপাত করিতেও তিনি প্রস্তুত। ব্রাহ্মণদের অধ্যাত্মতত্ত্ব এতদিন কর্ম্মের প্রতি উদাসীন ছিল, আজ তাহা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মপ্রাণতার সহিত বেশ মিলিয়া গেল। অর্জ্জুন শুধু বীরশ্রেষ্ঠ নহেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়াও তাঁহাকে মানিতে হইবে। একদিকে বহুসংখ্যক দুর্দ্ধর্ষ নারায়ণীসেনা, অন্যদিকে সারথীরূপী শ্রীকৃষ্ণ একা, এই উভয়ের মধ্যে তিনি সিদ্ধির অভ্রান্ত নিদর্শন কৃষ্ণকেই সহায়রূপে গ্রহণ করিলেন। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা মহাভারতকে বিশুদ্ধ নীতিগ্রন্থ বলিয়া দেখিতে অভ্যস্ত ; তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে লইয়া বড় গোলে পড়েন,—বীরধর্ম্মের আদর্শের সহিত পাণ্ডবদের কয়েকটি কৌশলের মোটেই সামঞ্জস্য নাই ; দ্রোণকে নিরস্ত্র করিতে গিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এক হীন কৌশলের আশ্রয় লইলেন, ভীমসেন অন্যায়রূপে দুর্য্যোধনকে আহত করিলেন। এই সকল কর্ম্মের দায়িত্ব স্বয়ং কৃষ্ণের স্কন্ধে চাপাইতে কবি কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ নহেন ; তাঁহার অতীন্দ্রিয়জ্ঞানে তিনি কর্ম্মজীবনে আবশ্যক বলিয়া ইহাদিগকে পরস্পর সম্বদ্ধ করিয়া কাব্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। ভগবানের জয় যদি উদ্দেশ্য হয়, ত যে উপায়ই অবলম্বন করনা, সকলই সাধু।

তাহা হইলে মনে হয়, ঐ প্রাথমিক আশীর্ব্বাণীর এরূপ ব্যাখ্যা করিলে কেহ আপত্তি করিবেন না—"নারায়ণ, নরশ্রেষ্ঠ নর এবং দেবী সরস্বতীকে পূজা করিয়া তবে লোকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে জয় আশা করিতে পারে।"

উপরের ব্যাখ্যা ঠিক হইলে অনেক পরিশ্রম করিয়া মহাভারত সম্বন্ধে যে সব মত খাড়া করা গিয়াছে সে সব মত আর টিঁকিবে না। এমন কি, এ পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, এক প্রাচীন কাব্য বাড়াইয়া মহাভারত রচিত হইয়াছে, সেই মূল কাব্যের নায়ক ছিল দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাতৃগণ। কিরূপ ভাবে কাব্য বাড়িয়া উঠিল, কাব্যের ক্রমবিকাশ লইয়া, আলোচনা না করিয়া

তাহার রসভোগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সাধু। ভারতবর্ষে যে এমন একদল কবি ছিলেন যাঁহারা কাব্য আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই; এই ভারত সূর্য্যের তলে একদিন মধ্যযুগের জীবন ফুটিয়াছিল। আধুনিক রাজপুতদের ন্যায় প্রাসাদদুর্গে সুখাসীন সেকালের রাজগণ এই সব পৌরাণিক উপাখ্যানের আবৃত্তি শুনিয়া যুদ্ধযাত্রার অবসরে চিত্তবিনোদন করিয়া লইতেন; অতীত বীরকীর্ত্তি প্রখ্যাপনকারী অনিয়তবাস কবিদের জন্য ইঁহারা অধীর উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করিতেন। কিন্তু এই মহাকাব্য ত এক একটি করিয়া গ্রথিত বীরগণের উপাখ্যানের সংগ্রহ মাত্র নহে, ইহা একভাবে ভাবিত, আর সে ভাব ইহাকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছে, প্লাবিত করিরা দিয়াছে; পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ইহা, ইহার আখ্যান ভাগ এক নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের চারিদিকে কলাকৌশল সহযোগে সংস্থাপিত। পাশ্চাত্যে ঐক্য জাতীয়ভাবে প্রকাশিত, সেখানে কবির প্রেরণা আসে স্বজাতিপ্রীতি হইতে। ইলিয়ড্ ইনিয়ড্ গ্রীস রোমের কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিতেছে। চ্যাপলিনের লা পুসেল ও ভল্‌টেয়ারের হাঁরিয়াড্ ফ্রান্সকে গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যে সকল শ্রেষ্ঠ উপায়ে বহুকে ঐক্যসূত্রে বন্ধন করিতে পারা যায়, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস একটি; এই ধর্ম্মবিশ্বাস হইতেও কাব্যের প্রেরণা আইসে; 'স্বর্গচ্যুতি,' 'মেসিয়া,' খ্রীষ্টধর্ম্মের গৌরব বাড়াইবার জন্য রচিত। এইরূপ জাতীয় ভাব ভারতে কখনও উদ্বুদ্ধ হয় নাই; ধর্ম্ম এবং সমাজ ছাড়া আর কোথাও ভারত তাহার ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পায় নাই। মহাভারতের প্রেরণা আসিয়াছে এই সমাজ ও ধর্ম্ম হইতে। হিন্দু সমাজ গঠনে ক্ষত্রিয়কে যে আদর্শ সাধন করিতে দেওয়া হইয়াছে, মহাভারত সেই আদর্শ প্রচার করে; ভগবানের যে মহিমা ক্ষত্রিয়ের সিদ্ধিপ্রদ, মুক্তিপ্রদ, মহাভারত ক্ষত্রিয়কে সেই ঈশমহিমা শিখাইতেছে। যে কৃষ্ণপূজা যুগে যুগে ভারত সাহিত্যে অবদান পরম্পরা সাধন করিয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণ সমাজে কাব্যে তাহার প্রতিচ্ছবি রাখিয়া গিয়াছে। শোভা সৌন্দর্য্য কোমলতা মনুষ্যত্ব, যাহা কিছু ভারতে লুকান ছিল, ব্রাহ্মণদের ভারত সে সব একত্র করিয়া রাখিয়াছে। শুধু সাহসবীর্য্যব্যঞ্জক সেই মহাপুরুষের অসামান্য কান্তিই বুদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। একজন জগতের বিষাদের অবতার জীবনের দুঃখকষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নির্ব্বাণ ছাড়া আর কোথাও শান্তি নাই। আর যাঁহারা বীরত্বে, মহৎকর্ম্মে অনুরক্ত তাঁহারা অন্যটির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি—আকৃষ্ট

হইলেন। দুইয়ের ভক্ত ভারত ও বিদেশ হইতে আসিয়া মিলিত। দার্শনিক রাজ মিনাণ্ডার বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারই সমসাময়িক হিলীওডর নামে তক্ষশিলাবাসী (রাজা অ্যান্টাল্কিডাস কর্ত্তৃক ভারতের কোনও রাজ সভায় প্রেরিত দূত) আর একজন গ্রীক, ক্ষাত্রদেবের শরণ লইয়া দেবদেব বাসুদেবের গৌরবচিহ্ন স্বরূপ গরুড় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! কুষণেরা যখন হিন্দুস্থানে এক প্রকাণ্ড সিথিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল, তখন কনিষ্কের এক বংশধর 'বাসুদেব' আখ্যাও গ্রহণ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক উপাদানের একান্ত অভাবে, এই সব লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করিতে পারি, বৌদ্ধদের মত ভাগবতদেরও ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা ছিল।

রচনারীতি দেখিয়াও মনে হয়,—মহাভারত প্রণয়নের মূলে আছে—বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মহাভারত এই বলিয়া স্পর্দ্ধা করে যে, সে শতসাহস্রী; অর্থাৎ, এমন প্রকাণ্ড গ্রন্থ যে, সাধারণ মানবরচিত গ্রন্থের পরিমাণ অনেক মাত্রায় অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। "ইতি শ্রীমহাভারতশাতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্···পর্ব্বাণি······অধ্যায়াঃ।" এই অভিধান পঞ্চমযুগের রীতির অনুমোদিত ছিল। খোয়াতে প্রাপ্ত ২১৪ খৃঃ এর শর্ব্বনাথের শিলালিপিতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়,—মহাভারত শতসহস্র শ্লোকের সংগ্রহ। "উক্তঞ্চ মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াম্" কিন্তু এই নাম বৌদ্ধ সাহিত্যের এক মূল গ্রন্থের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, সেই গ্রন্থের নাম 'শতসহস্রিকা' বা 'শতসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা।' জন সমাজে প্রচারের জন্য এই গ্রন্থ ক্রমে ক্রমে আয়তনে কমিয়া ২৫০০০, ৮০০০ (প্রাচীন প্রথায়, অষ্টসহস্রিকাই গ্রন্থের আয়তন হওয়া উচিত), ৭০০ বা ৫০০ ছত্রে আসিয়া পৌছিয়াছে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর, একই কথার বার বার প্রতিশব্দ, ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাহাতে গ্রন্থের কলেবর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে; স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার যেরূপেই হউক ইহাকে নির্দ্দিষ্ট আকার দিতে কৃতসঙ্কল্প, সুন্দর যাহা তাহাকে পাওয়ার পথে ভারত আর অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সে সুন্দরের সন্ধানে বৃহতের কাছে, বহুর কাছে চলিয়াছে। কথা সাহিত্যের "বৃহৎকথা"য় ও এইরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে; গুণাঢ্য, কথাসাহিত্যের ব্যাস; তিনি "বৃহৎকথা" লিখিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাসের শতসাহস্রী ও বৌদ্ধ শতসহাস্রিকায় লেখকদের যে ধর্ম্মানুরাগ প্রকাণ্ডগ্রন্থ রচনায় ধৈর্য্যের অনুকূল; তাঁহার গ্রন্থরচনায় সে ধর্ম্মানুরাগ ছিল না; তাই তাহার নানারূপ সংক্ষিপ্ত

সংস্করণ আছে। ক্ষেমেন্দ্র "মঞ্জরী" বাঁধিয়াছেন, 'সংগ্রহ' করিয়া বুদ্ধস্বামী তাহা কাব্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন, সোমদেব গ্রন্থখানি আকারে আরও সংক্ষিপ্ত কলেবর করিয়াছেন—বলিয়াছেন, "সংগ্রহং রচয়ামি অহম্।"

মহাভারতের উপমা খুঁজিতে গেলে আবার এই 'বৌদ্ধধর্ম্মেই আসিতে হইবে। মূল সর্ব্বাস্তিবাদিগণ সংস্কৃতকে শাস্ত্রীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষলাভের প্রমাণ স্বরূপ এক প্রকাণ্ড "বিনয়" গ্রন্থ জগৎকে দিয়াছেন, এই গ্রন্থ সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের বিনয়ের প্রায় দ্বিগুণ, সর্ব্বাস্তিবাদীগণের "বিনয়" আবার স্থবির, ধর্ম্মগুপ্ত, মহীশাসক, মহাসংঘিক, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিনয়কে আকারে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিনয় শতসহস্রিকা হইতেও বৃহৎ; এক গ্রন্থমালায়, শতসহস্রিকা যদি দ্বাদশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়, বিনয় গ্রন্থ তবে ত্রয়োদশ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। বিহারের শিক্ষাদীক্ষাবিষয়ক বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীর চারিদিকে অনুবাদক নানারূপ গল্প, জাতক, উপাখ্যান সন্নিবেশিত করিয়াছেন, প্রকৃত বুদ্ধের জীবনী হইল কি না, তাহা দেখেন নাই। ইহা একপ্রকার 'বুদ্ধবংশ,' মহাভারতের হরিবংশের মত। এই সকল উপাখ্যান ও বিচিত্র কথামালা লইয়া মহাভারত এইরূপ এক বিনয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার উদ্দেশ্য—ভাগবত প্রথামত ক্ষত্রিয়দিগকে শিক্ষাপ্রদান।

মিছে।

(শ্রীকালীপদ ঘোষ)

মিছে কেন বাঁধা কুন্তলভার, মিছে কেন আঁটা কাঁচলি,
মিছে কেন আর কাজলের টিপ্, মিছে শোভা সাজ সকলি;
মিছে কেন আর বকুলের মালা,
মিছে কেন আর চন্দন ঢালা,
মিছে কেন পরা নীলবাস খানি, শ্যাম বিনা সব বিফলই;
মিছে কেন বাঁধা কুন্তলভার, মিছে মেছে কেন আঁটা কাঁচলি

মিছে কেন আর তাম্বুলরাগ, মিছে নীপমূলে যাওয়া,
মিছে কেন আর নূপুরের ধ্বনি, মিছে কেন পথ চাওয়া,
মিছে কেন আর চকিত নয়ন,
মিছে কেন আর রচিত শয়ন,
মিছে কেন বল কুসুম চয়ন, মিছে অভিসারে ধাওয়া;
মিছে কেন আর তাম্বুলরাগ, মিছে নীপমূলে যাওয়া।

মিছে কেন সারা তাড়াতাড়ি কাজ, মিছে আসা ঘাটে বিকালে,
মিছে কেন সওয়া গঞ্জনা ভার, চলে গেছে বঁধু যেকালে,
মিছে কেন চ'খে অঞ্জন আঁকা,
মিছে কেন পায়ে রঞ্জন মাখা,
মিছে কেন বল অধরের হাসি যৌবন সুধা ফুরালে;
মিছে কেন সারা তাড়াতাড়ি কাজ, মিছে আসা ঘাটে বিকালে।

মিছে কেন সখি বিকচ কুঞ্জ, মিছে শ্যাম শোভা আকাশে,
মিছে কেন ফুটে অশোক পুঞ্জ মিছে কেন চলে বাতা[illegible],
মিছে কেন শুধু করা হা হুতাশ;
মিছে কেন ফেলা বেদনার শ্বাস,
মিছে কেন মরা মরম দহনে, মিছে কেন আর ভাবা সে;
মিছে কেন সখি বিকচ কুঞ্জ, মিছে শ্যাম শোভা আকাশে।

মিছে কেন ঐ পিয়ালের ফুল পাতাগুলি গেছে ছাড়ায়ে,
মিছে কেন বল আঁখি না মেলিতে বকুল বালার ঝরা এ,
মিছে কেন অলি আসে উড়ে উড়ে,
মিছে মধুটুকু গেছে যদি ঝরে,
মিছে কেন বল যমুনার পাড়ে গাছ গুলি শাখা বাড়ায়ে;
মিছে কেন ঐ পিয়ালের ফুল পাতাগুলি গেছে ছাড়ায়ে।

মিছে কেন আর তমালের শাখে শুকসারি গাহে বন্দনা,
মিছে কেন আর শিরীষের শিরে শিস্ দিয়ে ডাকে চন্দনা,
মিছে কেন আর মাধবী বিতানে,
পবন সঘন শিহরণ হানে,

মিছে কেন আর কন্দুক বনে পিকরাণী করে মন্ত্রণা,
মিছে কেন আর তমালের শাখে শুকসারি গাহে বন্দনা।

মিছে কেন আর ব্রজের কাননে হেসে নেমে আসে গোধুলি,
মিছে কেন ওই পথে চলে যেতে ফিরে ফিরে চায় ধবলী,
মিছে কেন মাঠে শ্যাম ঘাসগুলি,
পায় নাই যদি পূত পদধূলি,
মিছে কেন কর পরশন যাবি দাঁড়ায়ে র'য়েছে শ্যামলী ;
মিছে কেন আর ব্রজের কাননে হেসে নেমে আসে গোধুলি।

মিছে কেন আশা 'রাধা' ব'লে বনে বাজিবে আবার বাঁশরী,
মিছে কেন ভাবি শ্যাম যে আমার, আমি সে শ্যামের কিশোরী,
মিছে কেন সখি আমি গরবিণী,
তারে ভাল বাসি তার প্রণয়িণী,
মিছে কেন সখি করি তারে দোষী যদিই সে যায় পাসরি ;
মিছে কেন আশা 'রাধা' বলে বনে বাজিবে আবার বাঁশরী।

মিছে কেন সখি সংসার আর, মিছে কেন সহা যাতনা,
মিছে কেন আর বিফল প্রয়াস, মিছে কেন বল কামনা,
মিছে কেন বল আর না মরিব,
সে মরণে যদি কালারে পাইব,
মিছে নয় এই যমুনায় রব, পুনঃ ঘরে ফিরে যাব না ;
মিছে কেন আর সংসার সখি, মিছে কেন সহা যাতনা।

পতিতার সিদ্ধি

(উপন্যাস)

[শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাখু এইবারে বুঝিল, রাত্রির মত আর চারুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে না। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত তার বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার আলাপ-কুশলতার অভাবে তাহার কথায় চারু বিশেষরূপেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নহিলে বোধ হয় অত শীঘ্র সে ওরূপভাবে চলিয়া যাইত না। বোধ হয়, আরও কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া তাহার সঙ্গে চারুর গল্প করিবার ইচ্ছা ছিল। তাহারও তো চারুকে শুনাইবার অনেক কথা বাকি রহিয়া গেল! অন্ততঃ যে একটা কথা না বলিতে পারিলে, শুধু সে রাত্রি কেন, ইহার পরেও কত রাত্রি তার অনিদ্রায় কাটিয়া যাইবে, সে কথা ত চারুকে শুনাইবার উপায় রহিল না! বলিবার অনেক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি রাখু তাহা বলিতে পারে নাই। বলিতে পারে নাই—চারুকে দেখিলেই তার স্ত্রী রাখীর মুখ তার মনে পড়ে। মনে পড়ে কেন, দুই মুখের এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য যে, এক একবার চারুকে দেখিলে তাকে রাখী বলিয়াই ভ্রম হয়। অবশ্য চারু রাখী নয়। চারুর ভাষায় যে লালিত্য তাহা রাখীর ভাষায় ছিল না, চারুর বর্ণটাও বুঝি রাখীর বর্ণ হইতে অনেক উজ্জ্বল। তার হাসির ঝঙ্কারের মিষ্টতা—রাখীর বাপের সমস্ত ক্ষেতের আখ নিংড়াইলেও বুঝি পাওয়া যাইবে না! আর সম্পদ? ক্ষুদ্র ভূস্বামীর কন্যা হইলেও রাখু তার যে অহঙ্কার দেখিয়াছে, চারুর সম্পদের অধিকারী হইলে রাখীর কি আর মাটীতে পা পড়িত? না রাখুই তার দশ হাত দূরেও দাঁড়াইতে পারিত? বিনয়ের মূর্ত্তিস্বরূপ এই চারুর সঙ্গে সেই রূঢ়ভাষিণী পল্লীবাসিনীর কত প্রভেদ!

তথাপি—তথাপি চারুকে দেখিয়াই রাখুর মনে হইয়াছিল, যেন বহু বৎসর না দেখা এক কমল-কোরক হঠাৎ তার চোখের উপর শতদল সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চারু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই তাহাকে আবার দেখার সাধ অতি তীব্রভাবে যুবকের মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু আর ত সে তাকে

ডাকিতে পারে না! চারু আঁধারে ডুবিল, তার সঙ্গে রাখুর পুনঃ সাক্ষাতের আশাও বুঝি চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল!

ঘরের ভিতরে এক একবার ঝটিকা তরঙ্গ প্রবেশ করিতেছিল। ঘরের একটি কোণে থাকিয়াও আলোটা মাঝে মাঝে মৃত্যু-শিহরণে রাখুকে দ্বার বন্ধ করিতে মিনতি করিতেছিল। তথাপি সে বাতাসে বুক দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; গৃহ প্রবেশের সময় অন্ততঃ সে একবার চারুকে দেখিবে। দেখিবে, ঘরে ঢুকিবার মুখে সে একবার তাহার পানে চাহে কি না। ফিরিয়া চাওয়ার কোন মূল্য আছে কি না, সেটা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না। তাহার দাঁড়াইয়া থাকাতে তাহার মর্য্যাদা যে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এটাও সে ভাবিবার অবসর লইল না।

অন্ধকারে অন্ধকারে চলিয়া চারু তার ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিল। এতক্ষণ রাখু তাহাকে দেখিতে পায় পাই—এইবারে দেখিল। দেখিল—সে মুখ না ফিরাইয়াই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণের অপেক্ষায় যখন রাখু দেখিল, চারু দোরটা বন্ধ করিতেও আসিল না, এবং ঘরের নৃত্যশীল আলোক একটি বারের জন্যও তার ছায়ার একটু প্রান্ত পর্য্যন্তও নাচাইল না, তখন সে ফিরিয়া গালিচার উপরে বসিয়া আবার তামাক সেবনে নিযুক্ত হইল।

তামাক পুড়িয়া, আগুন নিবিয়া যখন নলটা গড়গড়ার ভিতর হইতে কেবল-মাত্র জলের বাষ্প বহিয়া তার কণ্ঠ শীতল করিতে আসিল, তখন আলোটা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল, সে কবাট বন্ধ করিতে ভুলিয়াছে।

অগত্যা তাহাকে উঠিতে হইল, কিন্তু কবাট বন্ধ করিতে যেমন সে আবার দোরটির কাছে আসিয়াছে, অমনি সে শুনিতে পাইল—সেই সন্ধ্যাকালের মত অদ্ভুত অপ্সরার গান ঝড়ের পৃষ্ঠে তালে তালে নৃত্য করিতেছে।

আর রাখুর কবাট বন্ধ করা হইল না। শুনিবার অত্যন্ত আগ্রহে চারুর ঘরের পানে চাহিয়া সেই অপূর্ব্ব সুরের রূপটাই যেন সে পান করিতে লাগিল। ঝড় সুরটাকে ভাঙ্গিয়া মোচড়াইয়া স্তবকে স্তবকে তাঁহার কানে উপহার দিতে-ছিল। অবকাশে অবকাশে সেই ভাঙ্গা সঙ্গীতের পুঞ্জীকৃত উচ্ছ্বাসে তাহার শ্রবণ লালসা তৃপ্ত না হইয়া এমন উছলিত হইল যে, রাখুর সেখানে স্থির থাকা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। কিন্তু মর্য্যাদা বোধের সামান্য মাত্রও অভিমান যদি তার থাকে, তাহা হইলে, চারু বিদায় গ্রহণকালে যেরূপ সংযত ব্যবহার

তাহার প্রতি দেখাইয়াছে, তাহা দেখিবার পর এরূপ গভীর রাত্রিতে তার ঘরে প্রবেশ রাখুর কোনও মতে কর্ত্তব্য হয় না।

সে তখন মুগ্ধ চিত্তের প্রেরণায় দুই চারিবার ঘরের ভিতরেই চলাফেরা করিল। দুই একবার বসিল, আবার উঠিল, কিন্তু একটিবারও চৌকাঠের বাহিরে পা দিতে ভরসা করিল না।

অবশেষে গানটা যখন তার নির্ম্মম মুখরতা একটা বিচিত্র গিট্‌কিরী ভরা করতবে মিশাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, রাখুও অমনি বদ্ধ নিশ্বাস মুক্ত করিয়া অবশাঙ্গের মত গালিচার উপরে শুইয়া নিশ্চিন্ত হইল।

১৩

আসল কথা—চারুর ঘরে আজ তার স্বামী অতিথি হইয়াছে। বারো বৎসর সে তাহাকে দেখে নাই। দেখিবার প্রত্যাশা ত করেই নাই—রাখেও নাই। পথহারা দেবতার মত ঝড়ের পৃষ্ঠে চাপিয়া সে যে আজ তার অপবিত্র বিলাস মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে; স্বপ্নের সাহায্যেও এ নারী যদি সে কথা ভাবিতে যায়, তাহা হইলে তাহার স্বপ্নটাও বুঝি পাগল হইয়া উঠে। অথচ জ্বলন্ত সত্যের আবির্ভাবের মত সেই ঘটনাই আজ ঘটিয়াছে।

নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সত্য সত্যই সে তার তখনকার বাবুর আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কোনও কারণে গৃহ-প্রবেশের উৎসব সেদিনকার মত স্থগিত থাকিলেও রাত্রিকালে তাহার বাবুর সঙ্গে তার দু'একজন বন্ধুর আগমনও সে যে প্রত্যাশা না করিয়াছিল এমন নয়। সে জন্য সে তাহাদের জলযোগের ব্যবস্থা ও সঙ্গীতাদির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যা হইতেই সে দেখিল, হঠাৎ ঝড়টা প্রবল হইয়া তার আয়োজন পণ্ড করিবার উপক্রম করিয়াছে। তথাপি তার বিশ্বাস ছিল, আর কেহ না আসুক, সমস্ত বাধা উপেক্ষা করিয়া অন্ততঃ বাবু আসিবে। যেহেতু তার জানা ছিল, সে দিন সে বাড়ীতে এমন একটি ভাড়াটিয়া স্ত্রীলোকও ছিল না যে, সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে চারুর সঙ্গী হইতে পারে।

ঝির মুখে তার বাবুর অবস্থানের কথা শুনিয়া লীলাবিলাসের এ একটা নূতন ভাব বুঝিয়া চারু তাহাকে ধরিতে আসিল। আসিয়া দেখিল, ঝি অন্ধকারে লোক ভুল করিয়াছে। অন্ধকারে যে দাঁড়াইয়া আছে, সে বাবু নয়—বাবুর একজন ইয়ার। বাবু আসে নাই জানিয়া, পথের পানে চাহিয়া সে তার

আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। রসিকতার অঙ্গস্বরূপ্ 'বাবু'র বিলাস-গৃহের সহচরেরা কখন কখন তার প্রণয়িনীর পদ-প্রহারে চরিতার্থ হইয়া থাকে। চারুও সেইভাবে তাহাকে কৃতার্থ করিতে গিয়াছিল। তাহার পায়ে সুকোমল মখমলের জুতা ছিল। সে 'ইয়ার'কে প্রহার করিবার ছলে মখমল দিয়া রাখুর জানুর পিছনে ধীরে আঘাত করিল। করিয়াই বুঝিল, সেও ঝিয়ের মতই ভুল করিয়াছে। ভুলের পরিমাণটা বুঝিতে গিয়া সে বিস্ময়-বিমোহে চাহিয়া দেখিল, তাহার জীবন-সৌধের সমস্ত প্রাচীর কোন্-এক ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডস্পর্শে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মাথা স্থির রাখা তখন তার অসম্ভব হইয়া পড়িল, সে দেয়ালের সাহায্যে ভগ্ন স্তূপের ভিতর হইতে আপনাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিল। এখন তার প্রাণটা অস্তিত্বের লোভে ঝড়ের বাতাসকে পর্য্যন্ত আঁকড়িয়া ধরিয়াছে।

বারো বৎসর পূর্ব্বে সে কুলত্যাগ করিয়াছিল। সে ত্যাগের ইতিহাস আমাদের এ আখ্যায়িকার পক্ষে একান্ত অবান্তর না হইলেও সে কথার উল্লেখ করিতে আমরা নিরস্ত হইব। তবে এ কথা আমরা বলিতে পারি, চারুর গৃহত্যাগে তাহার আত্মীয় বন্ধুগণের অল্পবিস্তর দোষ থাকিলেও রাখু সে সম্বন্ধে একেবারেই নিরপরাধ ছিল।

চারুর পিত্রালয় ছিল বর্দ্ধমান জেলায় দামোদরের তীরস্থ একটি গ্রামে, রাখুদের বাড়ী হইতে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে।

যখন তাহাদের বিবাহ হয়, তখন রাখুর বয়স ছিল এগারো, চারুর দশ। রাখু কুলীন, এইজন্য চারুর বাপ এই অল্প বয়স্ক বালককে একরূপ কিনিয়া আনিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিল।

তাহার পূর্ব্ব নাম ছিল রাখহরি। মায়ের তিন চারিটি সন্তান নষ্ট হইবার পরে সে জন্মিয়াছিল বলিয়া ঐ নাম সে মায়ের কাছে পাইয়াছিল। মা-বাপের মৃত্যুর পর যখন সে তার মামার অভিভাবকত্বের আশ্রয় পাইল, তখন তার বয়স সাত। মামা অভিভাবক হইলেও নির্ম্মম মামীর কাছে পড়িয়া এই হতভাগ্য বালক অতি অনাদরেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তার প্রতি তার মামীর ব্যবহার প্রতিবেশীদের চক্ষে সময়ে সময়ে এমনি কঠোর বোধ হইত যে অনেকেরই মনে হইয়াছিল, সেই অল্প বয়সে রাখু শ্বশুরের আশ্রয় না পাইলে তাহাকে সত্বর কোনও নিরুদ্দেশের পথে পলায়ন করিতে হইত।

শ্বশুরের ঘরে আসিয়া রাখু দিন কয়েক বেশ সুখেই অতিবাহিত করিয়াছিল।

কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য যে, বছর দুই শ্বশুরের গৃহে বাস করিতেই তার শ্বশুর মরিল এবং সেও বিষম ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইল। রোগ রহিল তিন বৎসর। এই তিন বৎসর ক্রমাগত জ্বরের উপর জ্বর রাখুর শরীর একেবারে জীর্ণ করিয়া ফেলিল।

এই কয় বৎসরের ভিতর কিন্তু বালিকার দেহ যৌবনের সমস্ত সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, আর বালক রাখু প্লীহা ও যকৃতের আত্যন্তিক বৃদ্ধিতে রক্তশূন্য দেহে হ্রস্ব হইতে হ্রস্বতর হইয়া ক্রমে একটি পুঁটুলির আকার ধারণ করিয়াছে।

চারুর পূর্ব্ব নাম ছিল রাখী; তাহার স্বামীর নামেরই অনুরূপ। নামটা বোধ হয় রক্ষাময়ী কিম্বা ঐরূপ কোন একটা নামের অপভ্রংশ। সেও বোধ হয় তার মায়ের অনেকগুলা মরা সন্তানের পর জন্মিয়াছিল। তার একমাত্র ভাই, তা হইতে বয়সে অনেক বড় ছিল। সেইজন্য বাপ মা তাহাকে শিশুকাল হইতে এতই আদরিণী করিয়া তুলিয়াছিল যে, বাল্যকাল হইতেই, তার ব্যবহারের অসংযম দেখিলেও, কেহ তাহাকে শাসন করিতে মনোযোগী হয় নাই। এই অন্যায় রকমের প্রশ্রয় পাওয়াই শেষে মেয়েটার সর্ব্বনাশের কারণ হইল।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন এই হতভাগ্য বালক শ্বশুর বাড়ীর সকলেরই একরূপ বিরক্তিভাজন হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ হইল রাখীর—যৌবনের নবোচ্ছ্বাসে অদম্য লালসার প্রেরণায় স্বামী নামের অযোগ্য এই বালকটাকে আর সে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না।

যখন ডাক্তার কবিরাজের মতে রাখুর বাঁচিবার আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না, তখন তার ভাই বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে তাহাকে তার মামার গৃহে রাখিয়া আসাই স্থির করিল।

শ্বশুরের দেশে আসিবার পর রাখু দুইবার মাত্র নিজের বাড়ীতে ফিরিয়াছিল। তাহার মধ্যে একবার মামার গৃহে একটা কার্য্যোপলক্ষে সে রাখীকেও সঙ্গে আনিয়াছিল। আসিয়া কিন্তু একমাসের মধ্যে মামী-শাশুড়ীর আচরণ বালিকার এমনই তীব্র বোধ হইয়াছিল যে, সে এক মাসের অধিক শ্বশুর-গৃহে তিষ্ঠিতে পারে নাই। রাখুর সঙ্গে কন্যাকে পাঠানো সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইলেও কন্যার প্রতি একান্ত মমতায় তার মা সে অভিভাকহীনের সংসারে তাহাকে আর পাঠাইতে সাহসী হইল না।

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস—রাখু এখন মরে ত তখন মরে করিয়াও মরিল না। মরিল—রাখীর মা ও বাপ।

ইহারই কিছুকালের পরে রাখুর মাতুলের কাছে সংবাদ আসিল, 'রাখুর কল্যাণের জন্য কালীঘাটে 'মানত' করিতে গিয়া তাহার পত্নী আদিগঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে।

তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছিল, তাহার এক দূর সম্পর্কিয়া মাসী। মাসী কলিকাতায় কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে রাঁধুনী বৃত্তি করিত। তাহার চরিত্র ভাল ছিল না। সংসারে নানাবিধ পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অসংযত চিত্তের প্রেরণায় যখন বালিকা বাপের বাড়ীতে অবস্থানে জ্বালা বোধ করিতেছিল সেই সময় মাসী তাহাকে প্ররোচনায় ও প্রলোভনে কুলের বাহির করিল। কলিকাতায় মাসীর আয়ত্তে আসিয়া অভাগিনী এই আত্মনাশের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। চরিত্রের সঙ্গে সে পূর্ব্ব নাম বিসর্জ্জন দিল।

এখন সে সহরে গায়িকার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গানের ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট অর্থাগম। বিলাসী সম্প্রদায়ে তার এমন প্রতিষ্ঠা যে, বহু ধনী যুবক তার কৃপালাভ করিতে পারিলে আপনাদের কৃতকৃতার্থ মনে করে। দু'চার জনের সর্ব্বস্ব ইতিমধ্যে তার পাদমূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কলিকাতায় দু' চারখানা ভাল ভাল বাড়ীর সে 'বাড়ীওয়ালী'। এ বাড়ীখানি সে নিজের ব্যবহারের জন্য করিয়াছে। আজ গৃহ-প্রবেশের দিনে এ বাড়ীতে খুবই ধুমধাম হইত। কেবল মাসী নাই বলিয়া সে শুধু নামমাত্র পূজা সারিয়া গৃহ-প্রবেশ করিয়াছে। মাসীর ইচ্ছা, বাড়ীখানি চারু তাহার নামে করিয়া দেয়। চারু সেটি করে নাই বলিয়া রাগ করিয়া সে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের রথ দেখিতে গিয়াছে। চারুকে এই হীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিয়া মাসীর কম লাভ হয় নাই। আর তাহাকে রাঁধুনীর কাজ করিতে হয় না। চারু যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার অনেকাংশই সে আত্মসাৎ করিত। তথাপি তার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। কেন মিটিবে? তা হ'তেইতো চারুর এমনভাবে অদৃষ্ট ফিরিয়াছে। রাখুর কাছে থাকিলে তার এতদিনে দু'বেলা দু'মুঠা অন্ন জোটাই ভার হইত। একমাত্র সেই ত চারুকে এই দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই সমস্ত কথা কহিয়া যখন-তখন সে চারুর নিকট টাকাকড়ির দাবী করিত। মাসীর ভাই-পো'ও মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া চারুর নিকট হইতে টাকাকড়ি জিনিষপত্র লইয়া যাইত।

অল্পদিন হইল চারুর ভাই আবার গোপনে গোপনে তাহার নিকট যাতায়াত করিতেছে। এই গোপন-যাতায়াতের ফলে, তাহার দশ পোনেরো বিঘা

নূতন নূতন জমি হইয়াছে; স্ত্রীর গায়ে এমন ভাল ভাল দু' চারখানা অলঙ্কার হইয়াছে যে, সেদেশের লোক সেরূপ অলঙ্কার দেখা দূরে থাক, সেগুলার নাম পর্য্যন্ত কাণে শুনে নাই! এই সবে সেদিন চারু ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়নের প্রায় সমস্ত খরচটাই দিয়াছে। এ সবগুলা দেখা এখন আর মাসীর একেবারেই সহ্য হইতেছিল না। তাহার উপর চারু পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতির পর বাড়ীখানা তার নামে না করা তার ভাইয়েরই পরামর্শে হইয়াছে বুঝিয়া রাগ করিয়া সে গৃহপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই তীর্থ-দর্শনের ছলে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু এই দীর্ঘকালের ভিতরে একদিনের জন্যও চারু কাহারও কাছে তাহার পরিত্যক্ত স্বামীর সন্ধান পায় নাই। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার পাপ-ব্যবসায়ের ফললোভী আত্মীয়গুলিকে তাহার কথা দুই একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কেহই কিছু বলিতে পারে নাই অথবা জানিয়াও তাহাকে বলে নাই। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে চারুর কোনও সংশয় ছিল না। বিশেষতঃ তাহার মাতুল-পত্নীর কৃপায় জীবনের দিন ক'টা আরও যে সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এটাও তার বুঝিতে বাকী ছিল না। তথাপি তার অন্তর হইতে একটা সংক্ষুব্ধ সংশয় মাঝে মাঝে সে-যুগের সেই রোগ-জীর্ণ বালকটার কথা জানিবার জন্য তাহাকে উত্তেজিত করিত।

এত ঐশ্বর্য্য-বিলাসের মাঝেও এক একবার তার কথা চারুর মনে পড়িত। এক একদিন এমন পড়িত যে, সে মরিয়াছে স্থির বুঝিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। প্রণয়প্রার্থী যুবকগুলার কারুণ্যপূর্ণ মুখচোখের পার্শ্ব দিয়া এক একদিন তার ছায়া-মূর্ত্তি উঁকি দিয়া চলিয়া যাইত। মনের খেয়াল জানিয়াও সে শরীর-শিহরণ রোধ করিতে পারিত না। বড় বড় মজলিসে তার গানে আবদ্ধ শ্রোতৃবর্গের অজস্র উচ্চ প্রশংসাধ্বনী ভেদ করিয়া রাখুর ব্যাধি-নিপীড়িত কঠোর ক্ষীণ ধ্বনি কতবার তার কর্ণে আঘাত করিয়াছে।

তবু সে স্থির বুঝিত, সে মরিয়াছে। অথবা যদিও অসম্ভব হয়, যদি রাখু কোনও দৈব ঘটনায় মরিতে মরিতে বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে এতদিনে সে আর একটা বিবাহ করিয়া তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। যদিও সে না ভুলে—তাহার তখন অপ্রীতিকর হইলেও তৎপ্রতি সেই রুগ্ন বালকের একটা ব্যাকুল মমতা স্মরণে সে বুঝিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে মন থেকে একেবারে মুছিয়া ফেলা রাখুর পক্ষে অসম্ভব। সত্যই যদি সে তাহাকে ভুলিতে না পারে তাহা হইলেও এ জীবনে চারুর সঙ্গে তার পুনঃ সাক্ষাতের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

সেই স্বামী সত্য সত্যই বাছিয়া বাছিয়া গৃহ-প্রতিষ্ঠার দিনেই তার ঘরে অতিথি হইয়াছে। আর আতিথ্যের দক্ষিণাস্বরূপ আগেই তাহাকে দিয়া তার সেবাব্রত সম্পূর্ণ করিয়াছে।

(১৪)

রাখুকে বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিয়া খাবার পাত্র হাতে ধরিয়া চারু তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। প্রথম বার মনের যে ভাব লইয়া সে ঘরে ঢুকিয়াছিল, এখন তার আর সে ভাব নাই।

প্রথমে বিস্ময়ে, লজ্জায়, সহসা প্রজ্বলিত অনুতাপে আপনাকে সে স্থির রাখিতে পারে নাই। স্বামীর সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিকে এমনই উগ্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, তার জন্য সে যেন সারা পৃথিবীর কোনও স্থানে একটু সুস্থিরভাবে দাঁড়াইবার স্থান দেখিতে পাইতেছিল না। সর্ব্বদেহের রক্তবিন্দু-গুলাও যেন সেই আক্রমণে ভীত হইয়া রুদ্ধ ধমনী-পথে পলাইবার স্থান না পাইয়া এক একবার সমবেত প্রবাহে তার বুকের দিকে ছুটিতেছিল।

স্বামীকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরের দণ্ডস্পর্শে যেন এক পলকে তার ঘৃণিত আচরণগুলা অগণ্য তিরস্কারকারী কথা লইয়া সহস্র পাপ-চিত্রের যবনিকা তার চোখের উপর মুক্ত করিয়াছে। সে যাতনা চারু সহিতে না পারিয়া ঘরে আসিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কাঁদিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। অশ্রুবিন্দুগুলা চোখের কোণে সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই এক একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত নিরবয়ব হইয়া অগ্নিভরা ঘরের বায়ুতে মিশিয়া যাইতেছিল।

তার পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া সে এমন স্থানে আপনাকে বসাইতে পারিতেছে না, যেখান হইতে সে কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টি নামাইয়া তার স্বামীরদিকে নিরীক্ষণ করে। সে দেখিল, স্বামীর দারিদ্র্যতার সম্পদ ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। ধর্ম্মপথে যার সঙ্গিনী হইবার একমাত্র তারই অধিকার ছিল, আজ সে কি না তার দত্ত গঙ্গাজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। সত্য সত্যই তখন চারু আপনাকে প্রবোধ দিবার একটাও কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। স্বামীর রূপটাকে উপলক্ষ করিয়াও যে আপনাকে একটা সান্ত্বনা দিবে, হা ভগবান, তারও উপায় তুমি কিছুই রাখ নাই! চারু দেখিল, তার কৃপা-ভিক্ষার্থী, চোখে কাতরতা মাখানো, কথায়

নারীর ভাষা জড়ানো, পুরুষনামধারী মেয়েগুলার মাঝখানে যদি একবার তার স্বামীকে সে বসাইতে পারিত, তাহা হইলে রাখুর সে পুরুষোচিত মূর্ত্তি জলাশয়ে একমাত্র প্রস্ফুটিত পদ্মের শ্রীতে দীপ্যমান হইত। আপনাকে হারাইয়া তাই চারু মেঝেয় মুখ ঢাকিয়া, অন্ধকারের ভিতর হইতে নিজেকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এবারে কিন্তু ভাব তার অন্যরূপ। স্বামীর সঙ্গে কথা কহিয়া এবারে সে উল্লাস বিষাদে, আশা নিরাশায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। উল্লাস—স্বামী তার স্নেহের উপহার অতি আদরে গ্রহণ করিয়াছে। বিষাদ—হতভাগী রাখীর এ সৌভাগ্য একদিনের জন্যও ঘটে নাই। আশা—স্বামীর সহিত আলাপে তার মন বলিতেছে, সে তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে। নিরাশা—যদিই সে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলেও সমাজের মধ্যে স্বামীর পাশে বসিয়া পরিণীতা ভার্য্যার পবিত্র অধিকার এ জন্মে আর সে লাভ করিতে পারিবে না; রক্ষিতা বারাঙ্গনারই মত, শুধু তার ভোগের সামগ্রী হইয়া থাকিবে মাত্র। এই আশা নিরাশার মধ্যে পড়িয়াও রাখুকে সে ধরিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই চারু সঙ্কল্প করিল, বুদ্ধির দোষে হারাইয়াও, শুধু দেবতার আশীর্ব্বাদে অভাবনীয় রূপে যাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছি, তাহাকে যে কোন উপায়ে আবার আপনার করিয়া লইব। ঘরে আসিয়াই প্রথমে সে স্বামী প্রাপ্তির কামনা করিয়া ভক্তিভরে তার প্রসাদ গ্রহণ করিল। তারপর স্বামীকে ধরিবার উপায় স্থির করিতে বসিয়া গেল।

সে একবার আপনার বিভবের দিকে চাহিল। ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি, এই সমস্ত দিয়াই সে রাখুকে প্রলুব্ধ করিবার কামনা করিল। কিন্তু চারু দেখিতে পাইল, তার সমস্ত সম্পদ তার স্বামীর পায়ে অঞ্জলি হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছে, আর সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

যদি এই ব্রাহ্মণ দরিদ্র হইয়াও তার পাপ-উপার্জ্জন লইতে সম্মত না হয়? দুই একবার ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য স্বামীকে তাহার ঘরে আনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু আনিবার কল্পনাতেই এই ঐশ্বর্য্যলাভের উপায়গুলা এমন মলিন মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার চোখের উপর নৃত্য করিতে লাগিল যে, কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরঙ্গ জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহাকেই চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইল।

তবে—চারুর মন এবারে তাহাকে বেশ আশ্বাস দিতেছে—স্বামী ধরিবার নাগপাশ তাহার কণ্ঠদেশে বিধাতা জড়াইয়া রাখিয়াছে। রাখুর কথায় চারু বেশ বুঝিয়াছে, সে গান বাজনায় বিলক্ষণ পটু। তবে গানের চেয়ে বাজনাতেই তার দক্ষতা অধিক। সে যতই বিনয় দেখাইয়া বলুক না কেন, বুঝি তার মত 'বাজিয়ে' এই কলিকাতা সহরেই অতি অল্প আছে।

চারু উপায়টার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিল। খাবার পাত্রগুলা প্রথমে সে বারান্দায় রাখিতে গেল। গিয়া দেখিল, স্বামী এখনও দোর খুলিয়া রাখিয়াছে। উঁকি দিয়া দেখিল, সে গালিচায় বসিয়া হেঁট মাথায় এখনও তামাক টানিতেছে।

সে ফিরিল, পাছে ঝড়ের বাধায় তার কার্য্য সিদ্ধ না হয়,—দোরটা খুলিয়া রাখিল। এইবারে বিনা সুর যোগে দোরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই সে একটা গান ধরিল। দেখিল—স্বামী গালিচা ছাড়িয়া দোরের কাছে দাঁড়াইয়াছে।

দেখামাত্র তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বারাঙ্গনা কত যে হতভাগ্যের বক্ষ সামান্য অপাঙ্গভঙ্গে ভাঙ্গিবার মত করিয়াছে, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু নিজে এই এতকালের মধ্যে কাহাকেও দেখিয়া এরূপভাবে বক্ষের স্পন্দন অনুভব করে নাই। সে তাহাদের লইয়া যাদুকরীর ইঙ্গিত সাহায্যে খেলা করিত মাত্র। আজ নিজে সে খেলার পুতলী হইয়াছে। এ স্পন্দন সে সহ্য করিতে অসমর্থ হইল—তাহার দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। গান সুর-লয়-হারা হইবার উপক্রম করিল। কোনও প্রকারে বুকটা চাপিয়া গানটাকে কোনও রকমে সে শেষ করিল। শেষ করিতেই সে দেখিল, রাখু দোর ছাড়িয়া আবার গালিচায় শয়ন করিয়াছে।

এবারে সে ঘরের অপর পার্শ্বে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। আয়নাটি যেমন বড়, তেমনি উজ্জ্বল; তাহাতে সমস্ত দেহটা সমান দৈর্ঘ্যে পরিস্ফুটরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। সেইখানে দাঁড়াইয়া আপনাকে সে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। এতক্ষণ আপনার নূতন বেশে নূতন মূর্ত্তি দেখিবার অবসর পায় নাই। বেশের পরিবর্ত্তনে তার শ্রীর কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া সে হাসি রাখিতে পারিল না। সে তখন প্রতিবিম্বটাকে তিরস্কার ছলে বলিতে লাগিল—"বা! বেশ তো কুলের বউটি সেজেছিস পোড়ামুখী! কিন্তু সেজেই বা তুই করলি কি! সে তো কই তোকে চিনতে পারলে না! সে পুরুষ মানুষ—এই বারো বৎসরে তার শ্রী বদ্‌লে' সে যেন এক নতুন মানুষ

গড়ে' উঠেছে, তবু তুই তাকে দেখামাত্র চিন্‌লি, কিন্তু সেত তোকে চিন্‌তে পারলে না!"

হৃদয়ের যে বিশেষত্বটুকু লইয়া নারীর নারীত্ব, শত অকার্য্যের প্রলেপেও সেটিকে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। স্বামীর উপর অসংখ্য অত্যাচারে তার মনে যে তীব্র অনুশোচনা জাগিয়াছে, তাহার ভিতরেও, স্বামী যে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, সে জন্য চারুর মনে তীব্রতর অভিমান জ্বলিয়া উঠিল। যদিও সে বুঝিয়াছে, রাখুর তাহাকে না চেনা ভালই হইয়াছে, তথাপি সে অভিমান ত্যাগ করিতে পারিল না। সে স্বামীকে চিনিল, স্বামী তাহাকে চিনিল না কেন? ভালবাসার চক্ষে সে যদি রাখীকে একদিনের তরেও দেখিত, তাহা হইলে কখনই সে এমন ভুল করিতে পারিত না! প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি রাখীকে চারু গোটাকতক টিটকারী দিল। তথাপি তাহাকে বাঁধিতে হইবে। এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও এই বিষম ঝড়ে সে আপনাকে সর্ব্বপ্রথম নিরাশ্রয় মনে করিল। যার আশ্রয়ে আজকাল সে ছিল, সে কাপুরুষ ঝড়ের ভয়ে জ্বরের অছিলা করিয়া তার কাছে আসিতে পারিল না। লোকের ঘরে ঢুকিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে চোরগুলার পক্ষে আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভদিন। তারা যদি আজ তার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া যাইত? অভাগিনীদের চোরের হাতে এরূপ মৃত্যুর কথা সে যে না জানিত এমন নহে। সে দেখিল, শাস্ত্রের আদেশে ধর্ম্মতঃ যে তাকে রক্ষা করিবার অধিকারী, তাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এই দুর্য্যোগের রাত্রিতে দেবতার নির্দ্দেশে সে যেন তাকে আজ রক্ষা করিতে আসিয়াছে। আর চারু কোনও মতে তাহাকে ছাড়িতে পারে না। যদি ধরিতে না পারে, এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাকে বসাইয়া সে গঙ্গায় ডুব দিয়া মরিবে।

রাখুকে বাঁধিতে চারু কোমর বাঁধিল। প্রতিবিম্বকে সম্বোধন করিয়া সে বলিয়া উঠিল—"রাখী, ও রকম হাতছাড়া স্বামীকে বশে আনা, তোর মত লজ্জাশীলা কুলবধুর কর্ম্ম নয়। যদি পারে, ও সে এই লোক-মজানো চারী। সে তখন যথা সম্ভব সত্বর সেই অবস্থাতেই একরূপ বেশ-বিন্যাস করিয়া লইল। মাথার চুলগুলা সে এলোমেলো করিয়াছিল, সেগুলাকে সে বুকে পিঠে ফেলিয়া এক রকম মনোহর করিয়া তুলিল। ইঙ্গিত, কটাক্ষ, মুখের হাসি সে কার্য্যোপযোগী করিয়া,—যে সমস্ত হাবভাবে সে লোক ভুলায়,—তার একটা অবলম্বনে অরগ্যানের সুর সংযোগে এবারে গাহিতে চলিল।

অরগ্যানের পার্শ্বেই সেই দাঁড়া-আয়না। গাহিবার সময়ে হাবভাবগুলা ঠিক রাখিবার জন্ত সেটাকে সে ইচ্ছাপূর্ব্বকই সেইখানে রাখিয়াছিল। চারু গাহিতেছে, এক একবার আয়নার দিকে মুখ ফিরাইতেছে, এক একবার যেন অন্তমনস্কের মত দোরের দিকে চাহিতেছে। হু'চার বার দেখিয়া যখন বুঝিল, রাখু সেখানে আসে নাই, তখন গানটা কোনও রকমে শেষ করিয়া যখন আর একবার সে আয়নার পানে চাহিল, তখন দেখিল—রাখুর প্রতিমূর্ত্তি তাহার মূর্ত্তির বহু পশ্চাতে নিশ্চল প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই বুঝিল, রাখু দোরের পার্শ্ব হইতে অন্ধকারের সাহায্য লইয়া লুকাইয়া তাহার গান শুনিতেছে। সে এইবারে জয়ের সন্নিকটে আসিয়াছে বুঝিয়া সেই প্রতিবিম্বের চোখে একটা মিষ্ট তীব্র কটাক্ষ হানিয়া মাথাটা ঈষৎ ঘুরাইয়া চুলগুলা তার একরূপ নূতনভাবে পিঠে মুখে সাজাইয়া লইল। কিন্তু সে রাখুকে দেখিতে মুখ ফিরাইল না।—যেন সেখানে আর কেহ নাই, এরূপ-ভাবে প্রতিবিম্বকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল—"দূর ছাই, ঘুম তো হবেই না, তখন এস না গা, হু'জনে মুখোমুখী বসে গান গেয়ে রাতটা কাটিয়ে দিই।"

সত্য সত্যই রাখু চারুর ঘরের বারান্দায় আসিয়া সসঙ্কোচে লুকাইয়া তাহার গান শুনিতেছিল। প্রথম গানের সময় সে কোনও ক্রমে জোর করিয়া আপনাকে ঘরের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিল। দ্বিতীয় বারে যখন চারু স্বরের সঙ্গে গান ধরিয়াছে, তখন আর সেই আকর্ষণে তার বসিয়া থাকিবার ক্ষমতা রহিল না।

এবারে সে গায়িকার স্বর-লয়-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইল। সঙ্গতের সঙ্গে হইলে এ গান আরও না জানি কত মধুর হইতে পারে। সঙ্গতহীন গান—সে তো রাগ-রাগিণীর অঙ্গচ্ছেদ। চারু গাহিতেছে শুধু তাহাকে শুনাইবার জন্ত। কিন্তু এরূপ কার্য্য করিতে এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতজ্ঞা নারী মর্ম্মে কতই না বেদনা অনুভব করিতেছে! তাহার এমন গানে বাজাইবার লোক নাই! তথচ একটু আগে সে চারুর কাছে বাজনা জানার পরিচয় দিয়াছে। এই সমস্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া সে স্থির করিল, এবারে চারু গান ধরিলে সে বিনা সঙ্গতে তাকে আর গাহিতে দিবে না। বিশেষতঃ প্রথমবার যে বস্তুটাকে দেখিয়া সে একটা বড় রকমের বিচিত্র সিন্দুক মনে করিয়াছিল, তাহার ভিতর হইতে অপূর্ব্ব তেজে স্বর বাহির হইতে দেখিয়া সে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছে যে, সেইটার সঙ্গে নিজের গলাটা মিলাইবার লোভও সে যেন কিছুতেই সম্বরণ করিতে

পারিতেছে না। যা থাকে ভাগ্যে চারুর অনুমতি লইয়া সে তার ঘরে প্রবেশ করিবে।

সে কথা কহিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় চারুর প্রতিবিম্ব অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে তাহার চোখ হুটাকে যেন গ্রাস করিতে আসিল। লজ্জায় সে দৃষ্টি তার চোখের উপর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মুখ ফিরাইতে গিয়াই সে চারুর আবাহন কথা শুনিতে পাইল। চারু যথাসম্ভব উচ্চ কণ্ঠেই কথাগুলা বলিয়াছিল, তথাপি বাতাসের শব্দ তার অর্দ্ধেকটা গ্রাস করিয়া ফেলিল। শেষাংশটুকু শুনিবামাত্র এমন সে শিহরিয়া উঠিল যে, কিছুক্ষণের জন্ত তাহাকে দোর ধরিয়া দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু সেই সঙ্গেই সে বুঝিতে পারিল, চারুকে সে দেখে নাই, তার প্রতিবিম্ব মাত্র দেখিয়াছে। দোর ধরিতে গিয়া আয়নার ভিতরে চারুর প্রতিমূর্ত্তি হইতে দূরে অবস্থিত নিজের প্রতিবিম্বটাকেও সে দেখিতে পাইল।

এইবারে লজ্জা, বিষম লজ্জা—লুকাইয়া চারুর গান শুনিতে আসিয়া সে তো তবে তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে! 'এসো' বলিতে সাহস করিয়াছে। প্রীতিময়ীর এই বড় আদরের আহ্বান শুনিয়াও সে যদি পলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয় চারুর কাছে চোর হইতে হইবে। দূর ছাই, আমারও যখন ঘুম হইবে না, তখন চারুর কাছে বসিয়াই রাতটা কোনও রকমে কাটাইয়া দিই। সেই অপূর্ব্বসুন্দরীর পরমাত্মীয়তার আকর্ষণের কাছে ব্রাহ্মণ যুবকের নৈষ্ঠিকতা পরাভূত হইল।

(১৫)

ঘরে প্রবেশ করিতেই রাখু দেখিল, চারু শ্রান্তি দূর করিতে তাকিয়ায় বাহু-মূল রাখিয়া, করপত্রে মাথা দিয়া, মদালস-দৃষ্টি উপরে তুলিয়া, ঈষদুন্মুক্ত ঊর্দ্ধদেহে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় যেন পটে আকা একখানি ছবির মত পড়িয়া রহিয়াছে।

শশব্যস্ততার ভাণ দেখাইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক মুহূর্ত্তের জন্ত নগ্নতাকে অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া অঞ্চলে দেহ আচ্ছাদিত করিতে করিতে চারু উঠিয়া বসিল।

রাখু চক্ষু মুদিল। দোরের দিক হইতে ঝড়ের একটা রহস্য হুহু করিয়া তার বুকের ভিতর ঢুকিয়া চোখ কান দিয়া অগ্নিরূপে বাহির হইতে বলিয়া উঠিল—"রাখু, তুই মরিতে আসিয়াছিস।" রাখু অন্তর হইতে উত্তর দিল—"নারায়ণ, নারায়ণ।"

চোখ মেলিয়া রাখু দেখিল, চোখ দুটাকে আরও যেন বিলোল করিয়া, সেই ঘরের কোথায় লুকানো কাহাকে দেখিতে নিশ্চল প্রতিমা বসিয়া আছে। সুতরাং রাখুকেই আগে কথা কহিতে হইল—

"ওগো, তোমার গান শুনতে এসেছি।"

"আসুন, আসুন—আমার কি এমন ভাগ্য হবে।"—বলিয়াই চারু রাখুকে আবাহন করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ও ঘরে দাঁড়িয়ে তোমার গান শোনবার চেষ্টা করেছিলুম। শুনতে পেলুম না বলে' তোমার দোরে এসেছিলুম, কিন্তু আসতে আসতেই গান শেষ হ'য়ে গেল। শুনে সাধ মিটলো না, তাই ঘরে এসেছি।"

"বেশ করেছেন।"

—বলিয়াই সে অরগ্যানের অন্তরাল হইতে একখানা আসন ক্ষিপ্রতার সহিত লইয়া আসিল এবং সেখানাকে সোফার উপর পাতিয়া রাখুকে বসিতে অনুরোধ করিল। রাখু না বসিয়া বলিল—

"এসে কি অন্যায় করলুম চারু?"

"না না এত আপনারই ঘর।"

"তোমার গানে আমার একটু সঙ্গত করতে ইচ্ছা হ'য়েছে।"

"বল কি গো, তা হ'লে যে আমি স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পাই।"

"তবু তোমার কাছে আসতে আমার ভয় হচ্ছিল—চারু, আমি বড় গরীব।"

"আমি তোমার চেয়েও গরীব।"

—বলিয়া, অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া রাখুকে হাত ধরিয়া আসনের উপর বসাইল।

এইবারে চারু যেন নিশ্চিন্ত হইয়া আল্‌গা চুলগুলাকে একটা কুণ্ডলিত ফণীর আকারের খুপি করিল এবং মুকুটের ভাবে সেটাকে মাথার উপর বসাইল। সম্মুখে অবস্থিত রাখুর দিকে এখন তার দৃষ্টি নাই, রাখুর পশ্চাতে আয়নার দিকে চাহিয়া সে কেশের এক অভিনব বিন্যাসে আপনাকে একটু উগ্র সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে লাগিল। সাজিতে সাজিতে সে দেখিল, রাখুর প্রতিবিম্ব এক একবার মাথা তুলিতেছে, আবার নামাইতেছে। ছায়ার পশ্চাৎ দিকটা মাত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, কিন্তু তাহাতেই স্বামীর দৃষ্টিকে সে যে তার মুখ-সৌন্দর্য্যের আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইয়াছে, এটা সে বিলাসিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না।

এইবারে সে দোরের কাছে গিয়া, মুখ বাহির করিয়া সন্তর্পণে কত কি যেন দেখিয়া লইল। তারপর—অন্ধকারের ঈর্ষা-কৃশা অপ্সরাগুলা এই বিলাস-গৃহে দৃষ্টি দিয়া, পাছে রাখুর সহিত তাহার চিরপরিচিত পত্নীর এই অপূর্ব্ব বাসরসজ্জা উত্তপ্ত করিয়া দেয়, তাই যেন সে নিঃশব্দে কবাট বন্ধ করিয়া, নিঃশব্দে তাহাতে খিল দিল।

রাখুর বক্ষে এক একটা মধুর আন্দোলন ক্রীড়া করিতেছিল, মস্তিষ্কটাও অবসন্নের মত হইতেছিল। চারুর মুগ্ধ লাস্য তার চক্ষুকে দৃষ্টিহারা করিবার উপক্রম করিয়াছে। তথাপি সে যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহার গতিবিধি দেখিতেছিল। এইবারে একটু গোল বাধিল চারু এখন সন্তর্পণে যেন কাহাকে লুকাইয়া দোর কেন বন্ধ করিতেছে, সে বুঝি বুঝি করিয়াও যেন বুঝিতে পারিল না; সলজ্জ ওষ্ঠাধরে বিলীনবৎ কথা বিপুল প্রয়াসে বাহির করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—

"দোর দিলে কেন চারু?"

"কেন বল দেখি?"

"আমি কেমন করে' বলব?"

"আমিই বা কেমন করে' বলব?"

—বলিয়াই চারু হাসিয়া উঠিল। রাখু আর কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া সে আবার বলিল—

"তোমার কি ভয় হচ্ছে?"

"ভয় হবে কেন চারু, আমার মনে হচ্ছে, আমি নিজের ঘরেই এসেছি।"

"আমার মন-ভুলানো কথা বলছ, না সত্যি বলছ?"

—বলিয়াই উত্তরটা দূর হইতে শোনা তৃপ্তিকর হইবে না বুঝিয়া, সে সোফার নীচে রাখুর পাদমূলে আসিয়া বসিল।

রাখু কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। বাস্তবিক কথাটার জ্ঞান না করিয়াই সে চারুর পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল।—গিয়াছিল তাহাকে একটু আত্মীয়তা দেখাইবার জন্য। চারু নিজেই যে একটু পূর্ব্বে সে ঘরটা তার বলিয়া তাহাকে আত্মীয়তা দেখাইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ কথাটার অর্থ তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। একটি নব-পরিচিতা নারী, তাহাকে দেখিবা মাত্র, এমন আশ্চর্য্য করা আত্মীয়তায়, গল্পে-পড়া প্রণয়-কথার মত তাহাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছে যে, তার প্রভাবে সে আপনার অবস্থার কথা পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়াছে।

চারুর দ্বিতীয় প্রশ্নে তার চমক ভাঙ্গিল। অতি সন্তর্পণে কপাট বন্ধ করার পর তার প্রশ্নটার সরল অর্থ রাখু গ্রহণ করিতে পারিল না। কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া সে কেবল চারুর মুখের পানে চাহিল।

যুবতী উর্দ্ধমুখী—উত্তরের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় নয়ন ভরিয়া তাহাকে দেখিতেছে। মাথার কেশ-শীর্ষ রাখুর উদাস দৃষ্টির তলে মন্ত্র-মুগ্ধ ফণীর মত যেন ফণা তুলিয়াই নিশ্চল হইয়াছে।

দেখিবা মাত্র রাখুর মন আবার দেশ-দেশান্তরে ছুটিতে চলিল। কিছুদূর গিয়া, এ সৌন্দর্য্যের উপমা খুঁজিতে অতীতের এক মাধুর্য্য-মণ্ডিত বিস্মৃতির কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দৃষ্টি তার মাতালের মত, বোধশক্তি হারাইয়া চারুর মুখখানির উপর যেন অবশভাবে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

দেখিয়াই চারু শিহরিল। রাখুর এরূপ অর্থশূন্য দৃষ্টির কারণ বুঝিতে তার বাকি রহিল না। ধীরে চরণ স্পর্শে তাহার চক্ষুকে প্রকৃতিস্থ করিয়া সে বলিল—

"বাঁয়া তবলা আনি?"

রাখু বলিল—

"আন।"

বাঁয়া-তবলা ও একটা হাতুড়ি সোফার উপর রাখিয়া, একটা ছোট হারমোনিয়ম লইয়া যখন চারু আবার রাখুর পাদমূলে বসিল, তখন ঘড়ীতে দুইটা বাজিল। শুনিয়াই রাখু বিস্মিতের মত বলিয়া উঠিল—

"তাই ত চারু, রাত যে শেষ হ'তে চল্‌লো!"

"থাকতে বলব নাকি?"

—বলিয়াই এবার সে গিট্‌কিরি দেওয়া হাসিতে ঘরটাকে এমন পূর্ণ কবিয়া দিল যে, কিছুক্ষণ ধরিয়া চারুর হারমোনিয়মে সুর দিবার পরও সে হাসির ঝঙ্কার রাখুর কান হইতে অপসৃত হইল না। তবলাটা যে বাঁধিতে হইবে, সেটা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। আবাঁধা তবলায় বার দুই চাঁটি দিতেই চারু বলিয়া উঠিল—

"ও কি করছ! বাজাবার ইচ্ছা থাকে ত বাজাও, নইলে আমি শুয়ে পড়ি। মিছে বসে' রাত কাটাই কেন?"

রাখু নিজের ভুল বুঝিয়া তাহা ঢাকিতে বলিয়া উঠিল—

"বাজাতেই ত এসেছি, কিন্তু তুমি বাজাতে বলছ, না তামাসা করছ?"

"কি রকম?"

"বাজিয়ে রইল স্বর্গে আর গাইয়ে রইল পাতালে; এতে কি বাজনায় হাত আসে?"

"তা কেন, তুমিই স্বর্গে ওঠ। এখানে তো যথেষ্ট স্থান আছে।"

"ওখানে কি আমার স্থান আছে?"

"আমার যদি থাকে, তাহ'লে তোমারও আছে।"

রহস্য করিতে গিয়া মূর্খ ব্রাহ্মণ চারুকে কাঁদাইয়া দিল। বুঝিল সে নিজের হীন ব্যবসায়কে স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে তুষ্ট করিতে হাত ধরিয়া চারুকে সে সোফার অপর প্রান্তে বসিতে অনুরোধ করিল। চারু বাধা দিল না—হারমোনিয়মটা লইয়া সোফার উপর উঠিয়া সে স্বামীর দিকে মুখ করিয়া বসিল।

চারু গান ধরিল—

"ভাল আমি বসিতে না জানি, তুমি ত ভাল তা জান হে।"

গাহিয়া কলির পুনরাবৃত্তি করিতেই রাখু তবলায় অঙ্গুলি-প্রহারে গানের অভিবাদন করিল।

১৩

ভাল আমি বাসিতে না জানি, তুমি ত ভাল তা জান হে।
আমি যদি ভুলে ভুলেছি তোমারে, তুমি ভুলে রবে কেন হে।
বাসনাবরণে নয়ন অন্ধ দিবস করেছি রাতি,
তুমি কেন নাথ, ধরে' এই হাত, ফিরালে না মোর গতি?
আজি এ মর্ম্মব্যথার কথা শুনেও যদি না শুনে হে!
এখন নিশীথে কেন দেখা দিলে বঁধু হে, সখা হে, প্রাণ হে।

গান শেষ হইতে আধঘণ্টারও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। চারু তাহার সঙ্গীতে অভিজ্ঞতার, যত রকম কস্‌রতে পারিল, পরিচয় দিল। রাখুও বাজনায় এমন হাত দেখাইল যে, চারু গাহিতে গাহিতে ইঙ্গিত আভাষে তার মুগ্ধতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না। গীত শেষে চারুই প্রথমে কথা কহিল—

"আমার গান শেখা আজ সার্থক হ'ল।"

"না চারু, ও কথা বল' না, অনেক ভাল ওস্তাদ তোমার গানে সঙ্গত করেছে; আমারই বাজনা শেখা সার্থক। আমি যে এ রকম গানের সঙ্গে বাজাবো, এ কথন স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"কিন্তু আমি যদি বলি, এ রকম মিষ্টি ওস্তাদী হাত আমি আর কখন শুনিনি ?"

রাখু উত্তর দিল না।

"আমার কথা অবিশ্বাস করলে ?"

রাখুর চোখে জল দেখা দিল। তাহার মুখে শুধু প্রশংসা-বাক্য শুনিয়া চারু সন্তুষ্ট হয় নাই। এ পর্য্যন্ত শ্রোতাদের মুখে এত সে প্রশংসা-বাক্য শুনিয়াছে যে, ইদানীং সে কথাগুলাতে আর তৃপ্ত হইবার কিছু ত ছিলই না, বরং সময়ে সময়ে সেগুলা তার বিরক্তির কারণ হইত। গাহিবার সময়ে তাহাকে এক একবার অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রত্যাশা করিয়াছিল—স্বামীর চোখে অশ্রুবিন্দু দেখিতে। নীরস স্বামী একটিবারের জন্যও তা' দেখায় নাই, অথবা মূর্খ বামুন তার গানের মর্ম্ম বুঝে নাই; শুধু সুর শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এইবারে তার চোখে জল দেখিয়া, কারণটা স্থির বুঝিতে না পারিলেও সে প্রফুল্ল হইল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল—

"লোকে কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়, তুমি যে কেঁদে উড়িয়ে দিলে গো !"

"না চারু, তোমার কথায় আমার ওস্তাদকে মনে পড়লো। তুমি যা বললে, আমার বাজনা শুনে তিনিও একদিন খুসী হ'য়ে ঐ কথা বলেছিলেন।"

"তিনি বেঁচে আছেন ?"

"বেঁচে থাকলে কাঁদবো কেন ? অল্পদিন হ'ল তিনি দেহ রেখেছেন।"

চারু বুঝিল, তার এতটা পরিশ্রম পণ্ড হইয়াছে। মূর্খ ব্রাহ্মণ শুধু সুর শুনিয়াছে, গানের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে নাই। রাখুর অশ্রুরেখা অবলম্বনে সে যে আজ তার হৃদয় অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, পরিশ্রম ব্যর্থ হইলেও তাহার ত পথ হইতে ফিরিয়া আসিবার উপায় নাই !

নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন আবার সে হারমোনিয়মে সুর দিল। সুর কীর্ত্তনের—রাখু শুনিবামাত্র বলিল—

"এ যে কীর্ত্তন ধরলে গো !"

"কীর্ত্তনের সঙ্গত জান না ?"

"মদনমোহনের দেশে বাস, কীর্ত্তনে সঙ্গত করতে জানি না, এ কথা কেমন করে' বলব ? তবে এ বাঁয়া-তবলায় ত কীর্ত্তনের অপমান করব না !"

ঘরের এক কোণে খোল ছিল, চারু মৃদু হাসিয়া ইঙ্গিতে সেইটা রাখুকে দেখাইয়া গান ধরিল—রাখুর খোল আনিবার অপেক্ষা রাখিল না।

চণ্ডীদাসের সেই চিরবিশ্রুতপদ—"কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান।" প্রথম প্রথম চারু শুধু সুরটাই আবৃত্তি করিতে লাগিল;—রাখুর খোল আনিবার অপেক্ষায় একবার, দুইবার, তিনবার—রাখু উঠিল না।

"খোল এনে দি ?"

"থাক্, তুমি গাও, আমি বসে' বসে' শুনি।"

চারু বুঝিল, পতিতার মুখ-নিঃসৃত মহাজন পদে সে সঙ্গত করিবে না। তখন চক্ষু মুদিয়া সে গাহিতে লাগিল—

কি মোহিনী জান, বঁধু, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।

চক্ষু মুদিয়াই সে আঁখর দিল—মুদ্রিত পলকের ভিতরেই বুঝি সে সমস্ত সঙ্গত বন্দী করিয়াছে—

(কি মোহিনী জান, ওহে মদনমোহন)
(তুমি পলকে মজালে মোরে
মোহনিয়া কি মোহিনী জান)
(পলক আমার ঘুমিয়ে গেল,
প্রাণ সখা কি মোহিনী জান)
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে নারিনু বঁধু, তোমার পিরীতি।
(বোঝা গেল না, সে কি চায়, চায় কি না চায়
পিরীতি রীতি বোঝা গেল না)

চারুর কানে সহসা মৃদুমধুর খোলের শব্দ প্রবেশ করিল। অভিমানিনী তাহা সহ্য করিতে পারিল না—চোখ মেলিয়াই সে বামহস্তে রাখুর দক্ষিণ হস্ত আবদ্ধ করিয়া আবার আঁখর দিল—

(কার চোখে সে চোখ রেখেছে
চোখ মেলে তা বোঝা গেল না)

রাখু এবার দু'টি কর পত্র পরস্পরে বাঁধিয়া কোলের উপরে জানু স্থাপিত করিয়া অপ্রতিভের মত বসিয়াছে।

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
(আমার সব বিপরীত)

(ঘরের বাইরে এসেও ঘর পেতেছি
এ যে আমার সব বিপরীত)
(এখন তুমিই আছ, আমার সব গিয়েছে,
(এখন শুধু তুমিই আছ, আমার সব গিয়েছে,
এখন শুধু তুমি আছ)
(আমার যেথায় যা ছিল পর করেছি
পরাৎপর তুমি আছ)
(বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও,
(যেন নিদয় হ'য়ো না)
(ওহে প্রাণবল্লভ, নিদয় হ'য়ো না)
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও
(যদি নিদয় হও)
(কি জানি যদি নিদয় হও)
(পদে অপরাধ বহু করেছি নাথ,
তাই যদি নিদয় হও)
(তবে দাঁড়াও হে, একবার দাঁড়াও হে)
(আমি তোমারই প্রাণ তোমারে দিই,
একবার বঁধু দাঁড়াও হে)

মন্ত্রাদিষ্টের মত সত্য সত্যই রাখু দাঁড়াইয়াছে, তার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ছুটিতেছে।

চোখ মুছিতে মুছিতে সত্যই সে অনুভব করিল, চারুর মাথা তার পায়ে লুণ্ঠিত হইতেছে।

"চারু।"

চারু মাথা তুলিল—উত্তর দিল না।

"তোমার ঘরে এসে আমি আজ ধন্য হ'য়েছি।"

হাঁটুতে ভর দিয়া যুক্তকরে সে স্বামীর মুখের পানে চাহিল মাত্র। বুঝি কথা কহিতে সে সামর্থ্য হারাইয়াছিল।

"আমার কথায় বিশ্বাস কর্‌লে না?"

"না।"

"এমন সৌভাগ্য আমার জীবনে কখন হয় নি।"

"বেশ ত মন-ভোলানো কথা কইতে জান? তা হ'লে তুমি মোহনিয়াই বটে।"

"সে তুমি যা বল, কিন্তু চারু, আমি মিছে কই নি।"

"যাও ঠাকুর, আর চারু চারু ক'র না।"

—বলিয়াই সে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াই আবার বলিল—

"তুমি হেরে গেলে, বলতে পারলে না—এটা তোমার ঘর।"

রাখু উত্তর করিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না। সে শূন্য দৃষ্টিতে মাথা ঘুরাইয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল মাত্র। বুঝি দৃষ্টি দিয়া সে চারুর ঐশ্বর্য্য মাপিবার চেষ্টা করিল। ব্যর্থ চেষ্টায় আবার সে চারুর মুখে তাহা ফিরাইয়া আনিল। চারু বলিল—

"বস,' তামাক আনি।"

রাখু একটু ব্যস্ততার ভাবেই বলিল—

"না না—প্রয়োজন নেই।"

"আমি দেখছি আছে।"

—বলিয়াই সে দোরের দিকে অগ্রসর হইল। রাখু প্রথমে সাগ্রহ কথায় তাকে নিষেধ করিল, যখন সে শুনিল না, তখন পিছন হইতে বাহুমূল ধরিয়া নিরস্ত করিল।

"ছিঃ! কর কি,—ছেড়ে দাও।"

"তা তুমি যত পার, তিরস্কার কর—আমি তোমাকে আর ভিজতে দেবো না।"

"তাতে কি হবে—আমি কি মরে যাব?"

"আমার জন্য ঠাণ্ডা লেগে যদি এ গলার সামান্যমাত্র ক্ষতি হয়, তাহলে আমার মহা অপরাধ হবে।"

"আর আমি কি গাইব মনে করেছ?"

"আর গাইবে না?"

"মুখ্‌খু বামুন, বুঝতে পারলে না?—আমি যে গানের ব্রত উদ্‌যাপন করলুম।"

"আমি যদি শুনতে চাই?"

"সে তোমার গান তুমি শুনবে।"

"তামাক আনো।"

চারু ধীরে কবাটে হাত দিল, আরও ধীরে খিল খুলিল। দোর খুলিতে যাইতেছে, এমন সময় রাখু আবার বলিল—

"তুমি কি—"

মুখ না ফিরাইয়াই চারু তার কথা শেষের অপেক্ষা করিল। শেষটা শুনিবার প্রতীক্ষাতেই তার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাখুর মুখ হইতে আর কথা বাহির হইতেছে না।

"কি জিজ্ঞাসা করছিলে, বল।"

রাখু বলিতে পারিল না।

"আমি 'কি' কি ?"

জিজ্ঞাসা করিয়াই চারু মুখ ফিরাইল। গান গাহিবার পর হইতেই তার চিত্তবৃত্তি এরূপ শান্ত হইয়াছিল, তার মনে এমন একটু সাহস আশ্রয় করিয়াছিল যে, স্বামীকে পরিচয় জাগাইতে আর তার শঙ্কা নাই। স্বামী সাহস করিয়া তাহাকে চিনে চিনুক, সে আর তাহার কাছে পরিচয় গোপন করিবে না। কেবল পারিবে না সে, উপযাচিকা হইয়া পরিচয় দিতে। বক্ষের স্বাগত স্পন্দনকে উপেক্ষা করিয়াও, তাই রাখুর প্রশ্নকে পূর্ণ দেখিতে দুইবার সে প্রতিপ্রশ্ন করিল, মুখ ফিরাইল—তবু তাহাকে নীরব দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"পুরুষ মানুষ, বলতে ভয় করছ কেন? আমি তোমাকে ভালবেসেছি কি না জিজ্ঞাসা করতে চাও ?

"না চারু!"

"বিশ্বাস করেছ ?"

"করেছি।"

"মাথা ঠিক রেখে বলছ তো ?"

রাখু মাথায় হাত দিল।

"দেখো, মাথা নেড়ে চেড়ে বেশ করে' দেখো—মাথা ঠিক আছে কি না। আমার এইরকম তিনখানা বাড়ী, প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার সম্পত্তি; অলঙ্কার, আসবাব, নগদে আরও ত্রিশ হাজার—"

"তোমার এত ঐশ্বর্য্য।"

"এ কি তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য, আর এক ঐশ্বর্য্যের কথা শুনলে তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে।"

"সেটা কি চারু ?"

"মাণিক দেখেছ ?"

"গল্পে শুনেছি।"

"সেই মাণিক, সাত রাজার ধন—বুঝেছ? বুদ্ধির দোষে হারিয়েছিলুম বহুকাল আগে;—আজ যেমন তোমার এ বাড়ীতে পায়ের ধূলো পড়েছে, অমনি অন্ধকারে সেটি আমার পায়ে ঠেকে গেছে। এই সম্পত্তি তোমাকে কি অমনি অমনি দিতে যাচ্ছি গা, সেই মাণিকটি ফিরে পেয়েছি বলে দিতে যাচ্ছি।"

রাখু অবাক্ হইয়া চারুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, চারুও কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে তার মুখ হইতে আর একটা কথা শুনিবার জন্য দাঁড়াইল। পরিচিত হইবার জন্য আর তার এক মুহূর্ত্তের বিলম্বও সহ্য হইতেছে না। কিন্তু এ মূর্খ ব্রাহ্মণ কথার ঘরে একেবারে কুলুপ দিয়া দাঁড়াইল। এখনও কি সে তাহাকে চিনিতে পারিল না ?

এমনি সময়ে ঘড়ীতে আধ ঘণ্টা বাজিল।

"ওমা! সাড়ে তিনটে বাজলো! তা' হ'লে ত রাত আর নেই বললেই হয়। তুমি বস, আমি তামাক পাঠিয়ে দিই।"

"পাঠিয়ে দিই মানে কি! তুমি কি আসবে না ?

"না এসে কোন্ চুলোয় যাব? তবে বোধ হয় তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তুমি ত একটু পরেই চলে' যাবে ?"

"যতক্ষণ না যাই, ততক্ষণ থাকতে পারবে না ?"

"যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ থাকতে পারবে না ?

"তোমার ফিরতে কত দেরী হবে, না জানলে কেমন করে বলব ?"

"কখন ফিরতে পারবো না জানলে আমিই বা কেমন করে' বলব ?"

"এক ঘণ্টা ?"

"ঘণ্টা হ'তে পারে, দিনও হ'তে পারে মাসও হ'তে পারে, বছরও হ'তে পারে।"

"আর একটা জন্মও হ'তে পারে।"

"তা হ'তেই বা আশ্চর্য্য কি ?"

"তুমি ফিরে এস।"

"তুমি থাকবে ?"

"তোমাকে যে অনেক কথা বলব মনে করেছিলুম, তার ত কিছুই বলা হ'ল না!"

"আর ব'লে দরকার কি ? বলবার সময় ত উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল !"

এই সময় প্রবল বাতাসে দ্বারটা সহসা পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

"ও রাখী, এখনও বিষম ঝড় !"

"কি বললে ?"

দমকা বাতাসে মনটাও যে তার উড়িয়া গিয়াছে এটা রাখু বুঝিতে পারে নাই। অন্যমনে মুখ হইতে পত্নীর নাম বাহির হইতেই সে এমন অপ্রতিভের মত হইয়া গেল যে ক্ষণেকের জন্য তার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

"রাখী কে গো ?"

"তাই ত চারু, আজ যে ঝড়ের রাত সেটা যে তুমি একেবারেই ভুলিয়ে দিয়েছিলে !"

চারু কবাট বন্ধ করিতে করিতে বলিল—

"সে ত আমিও ভুলেছিলুম গো, এখন যে বাইরের ঝড় ঘরে ঢুকলো,—রাখী কে ?"

"তুমি ফিরে এস; এসে শুনো।"

"আমার কাছে মিথ্যে কইলে ! তবে নাকি তোমার স্ত্রী নেই ?"

"ভ্যালা বিপদ, তুমি আগে ফিরেই এস না গো !"

"সে আমার সতীন নাকি ?"

"না চারু ও কথা বলতে নেই ! তোমাতে সধবার চিহ্ন দেখছি।"

চারু বামহস্তের আয়তি-চিহ্ন চুম্বন করিতে করিতে বলিল—

"ওমা, এটার কথা যে মনেই ছিল না। তা আমি এটার সম্পর্ক কি রেখেছি ?"

"তুমি রাখতে না বললেও ত সম্পর্ক যাবে না, ওটা বিধাতার দেওয়া।"

অতি উল্লাসে চারু বলিয়া উঠিল—

"সত্যি বলছ ?"

"কেন চারু, এ কথা আমাকে জিজ্ঞাস করছ ? হিঁদুর মেয়ে—হাতে যখন চিহ্ন রেখেছ, তখন এটা কি জান না ?"

"আমি যদি এখন সোয়ামীর কাছে যেতে চাই—"

"স্বামী নেবে কি না, বলতে চাচ্ছ ?"

"নেবে না ?"

"তা আমি কেমন করে' বলব ?"

"আমি যদি তোমার স্ত্রী হতুম ?"

রাখু পাগলের দৃষ্টিতে চারুর মুখের পানে চাহিয়াই চক্ষু নামাইল।

"ভয় কি ঠাকুর বল না।"

রাখু ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চারু স্থিরনেত্রে অবনত মুখ স্বামীর পানে তাকাইয়া তার সারা দেহটা যেন অন্তরিন্দ্রিয়ের নীরবতায় যোগ দিতে নিথর হইয়া গিয়াছে। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া হাত দিয়া চোখ মুখ মুছিয়া আবার যেই রাখু মুখ তুলিল, অমনি চারু বলিল—

"তামাক পাঠিয়ে দিই।"

—বলিয়াই এমন ক্ষিপ্রতার সহিত সে গৃহত্যাগ করিল যে, রাখু তাহাকে ফিরাইয়া, যে কথা বলিবার জন্য বুক বাঁধিতেছিল, সে কথা ঠোঁটের কাছে আনিতেও সে সময় পাইল না।

(ক্রমশঃ)

কৃপা-দান।

[কবিতা]

[শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘটক, এম্-এ]

(কীর্ত্তনের সুর)

(১)

আমি শুষ্ক ক্লিষ্ট তরু,—আছিনু দাঁড়ায়ে শীর্ণ এ-মূরতি নিয়ে ;
তুমি ঝটিকায় ভেঙ্গে,—সাজালে তাহায় নবীন পল্লব দিয়ে !

(২)

আমি দরিদ্র ভিখারী,—লালসা-অধীর, যত পাই তত লোভ !
তুমি অজানা-ধনের ভাণ্ডার দেখায়ে মিটালে দারিদ্র্য ক্ষোভ !

(৩)

আমি নয়ন থাকিতে অন্ধ যে পথিক,—কেবলি আঁধার দেখি ;
তুমি অভিনব আঁখি ফুটায়ে দেখালে—আঁধারে আলোক যে-কি !

(৪)

আমি নিকটে তোমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে ঘুরিলাম কত দেশ ;
তুমি "সাথেই" রয়েছ,—জানায়ে আমার করালে ভ্রমণ শেষ !

(৫)

মোর যা ছিল আজিকে লইয়ে দেখালে,—তবু মোর কত আছে ;
মোর স্মৃতি কেড়ে নিলে !—তুমি যা-দিয়েছ ভুলে যদি যাই পাছে !

(৬)

আমি আছিনু "অঙ্গার",—"কালী" ঘোচেনিকো "জলে ধুয়ে শতবার",
তুমি অনল পরশ,—"কৃপাদান" দিয়ে জ্বালালে "কালিমা" তার !

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

নবম পরিচ্ছেদ।

হাইকোর্টের রায় বাহির হইবার পর হইতেই পুলীসের আনাগোনা একটু ঘন ঘন আরম্ভ হইয়াছিল—সাজা কমাইবার প্রলোভনে যদি কেহ কোন নূতন কথা বলিয়া দেয় ! আমাদের ধরা পড়িবার পরই নানা সূত্রে এতকথা বাহির হইয়া গিয়াছিল যে পুলীসের জানিবার আর বোধ হয় বেশী কিছু বাকি ছিল না। কিন্তু তথাপি পুলীস একবার নাড়া চাড়া দিয়া দেখিল আরও কিছু সংগ্রহ করা যায় কি না। নির্জ্জন কারাবাসের সময় মানুষের মন অপরের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য-যে কিরূপ অস্থির হইয়া উঠে, পুলীসেরা তাহা বেশ ভাল করিয়াই জানে। দুই এক মাস যদি কাহারও সহিত কথা কহিতে না পাওয়া যায় তাহা হইলে মানুষের টিকটিকি, আরস্থলার সহিতই কথা কহিতে ইচ্ছা হয়—পুলীস ত তবু মানুষ ! কতকগুলা বাজে কথা কহিতে গেলে তাহার সহিত দুই একটা গোপনীয় কথাও বাহির হইবার সম্ভাবনা। আর ২০।৩০ জন লোকের নিকট ঘুরিলে অন্ততঃ চার পাঁচ জনের নিকট হইতে এইরূপ এক আধটা কাজের কথা পাওয়া যায়। পুলীসের তাহাই ভরসা।

কথা বাহির হইবার আরও একটা কারণ এই যে, নামে 'গুপ্ত সমিতি' হইলেও কতকটা অভিজ্ঞতা ও কতকটা অর্থের অভাবে আমাদের কার্য্যপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইউরোপীয় গুপ্তসমিতিগুলির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষের অধীনে থাকে; এবং এক বিভাগের লোক অন্য বিভাগের লোকের সহিত বিনা প্রয়োজনে পরিচিত হইবার অবসর পায় না। সমিতির অধ্যক্ষদের এই চেষ্টা থাকে যেন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন কর্ম্ম ভিন্ন অপরের কর্ম্ম না জানিতে পারে। এইরূপ নিয়ম থাকায় এক আধজনের দুর্ব্বলতায় সমস্ত কাজ নষ্ট হইতে পায় না। নানা কারণে সেরূপ ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে হইয়া উঠে নাই; আর তাহার উপর আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ গল্প করিবার প্রবৃত্তি ত আছেই। আমাদের দেশে প্রত্যেক সমিতির ভিতর হইতে যে দুই একজন করিয়া সরকারী সাক্ষী বাহির হইয়াছিল কার্য্যপ্রণালীর শিথিলতাই তাহার প্রধান কারণ। দলাদলি ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ফলেও অনেক সময় অনেক সমিতির গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। যে জাতি বহুদিন শক্তির আস্বাদন পায় নাই, তাহাদের নেতারা যে প্রথম প্রথম ক্ষমতা লোলুপ হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। আর নেতাদিগের মধ্যে অযথা প্রভুত্ব প্রকাশের ইচ্ছা থাকিলে অনুচরদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও অসন্তুষ্টি অনিবার্য্য।

একটা সুবিধার কথা এই যে গল্প করিবার প্রবৃত্তি শুধু আমাদের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। ইউরোপীয় প্রহরীরাও প্রায় সমস্ত দিন জেলের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিত। তাহাদের মধ্যেও বেশ একটু দলাদলি ছিল। একদল অপর দলকে জব্দ করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদেরও সাহায্যপ্রার্থী হইত; এবং তাহাদের কথাপ্রসঙ্গে জেলের অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইত।

কিছু দিন এইরূপ থাকিবার পর শুনিলাম যে Civil Surgeon আমাদের আন্দামানে পাঠাইবার জন্য পরীক্ষা করিতে আসিবেন। যথা সময়ে Civil Surgeon আসিয়া পেট টিপিয়া, চোখ দেখিয়া সাত জনের ভবনদী পারের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সুধীর ও আমি তখন রক্তআমাশয়ে ভুগিতেছিলাম বলিয়া আমাদের আরও কিছু দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

সাধারণ কয়েদীর পক্ষে নিয়ম এই যে একবার রোগের জন্য আন্দামান যাওয়া বন্ধ থাকিলে আরও তিন মাস অপেক্ষা করিতে হয়; কিন্তু আমাদের

বেলা সে আইন খাটিল না। সরকার বাহাদুরের আদেশ ক্রমে আমাদের ছয় সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

কারাগৃহ হইতে একবার দেশকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। একদিন ভোরবেলা আমাদের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া আমাদের একখানা গাড়ীতে চড়ান হইল। দুই পাশে দুইজন সার্জেণ্ট বসিল; আর গাড়ী খিদিরপুর ডকের দিকে ছুটিল।

জাহাজে উঠাইয়া দিয়া একজন সার্জ্জেণ্ট বিদ্রূপ করিয়া বলিল—Now say, my native land farewell.' আমরা হাসিয়া বলিলাম—Au revoir. বলিলাম বটে, কিন্তু ফিরিবার আশাটা নিতান্তই জবরদস্তি মনে হইতে লাগিল।

রাজনৈতিক কয়েদী আমরা শুধু দুই জন মাত্র ছিলাম—সুধীর ও আমি। জাহাজের খোলের মধ্যে একটা কামরায় আমরা ছিলাম; অপর কামরায় অন্যান্য কয়েদী ছিল। জাহাজের একজন বাচ্ছা কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদের ফটো তুলিয়া লইল। বিলাতের কোন্ কাগজে সে এই সমস্ত ফটো ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। কথাটা শুনিবামাত্র আমি পাগড়ীটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইলাম! সস্তাদরে যদি একটা ছোট খাট বড়লোক হইয়া পড়া যায় ত মন্দ কি!

তিন দিন তিন রাত সেই জাহাজের খোলের মধ্যে চিঁড়া চিবাইতে চিবাইতে যাইতে হইবে দেখিয়া, সুধীর ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে একটা হাতীর মত জোয়ান—তিন মুঠা চিঁড়া চিবাইয়া তাহার কি হইবে? পুলিসের একজন পাঞ্জাবী মুসলমান হাওলদার বলিল—"বাবু, যদি আমাদের হাতে ভাত খাও, ত দিতে পারি।" মুসলমানদের মধ্যে সহানুভূতিও আছে, আর ভাত খাওয়াইয়া হিন্দুর জাত মারিবার ইচ্ছাও একটু একটু আছে। আমরা বলিলাম—"খুব ভাল কথা। আমাদের জাত এত পাকা যে, কোন লোকের হাতের ভাত খাইলেও তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে না।" সেখানে শিখ হাওলদারও ছিল তাহারা ভাবিল পেটের জ্বালায় আমরা পরকালটা একেবারে নষ্ট করিতে বসিয়াছি! তাই তাহারাও আমাদের ভাত দিতে চাহিল। আমরা নির্ব্বিবাদে উভয়দলের রান্না ভাত খাইয়া পেটের জ্বালাও থামাইলাম ও আপনাদের উদারতাও সপ্রমাণ করিলাম। শিখেরা ভাবিল—"বাঙ্গালী বাবুরা বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু উহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান একেবারে নাই।" যাই হোক, ধর্ম্ম বাঁচিল কি মরিল তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু দুটি ভাত খাইয়া সে যাত্রা প্রাণটা বাঁচিয়া

গেল। জাহাজে আমাদের নোয়াখালী জেলার অনেকগুলি বাঙ্গালী মুসলমান মাল্লাও ছিল, তাহাদের হাতে রান্না ভাত ও কুমড়ার ছক্কা যেন অমৃতোপম মনে হইল।

যাই হোক, কোনও রূপে তিন দিন জাহাজে কাটাইয়া চতুর্থ দিনে পোর্ট ব্লেয়ারে হাজির হইলাম। দূর হইতে জায়গাটি বড়ই রমণীয় মনে হইল। সারি সারি নারিকেল গাছ, আর তাহার মাঝে মাঝে সাহেবদের বাংলোগুলি যেন একখানি ফ্রেমে বাঁধান ছবির মত। ভিতরের কথা তখন কে জানিত?

দূরে একটা প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ী দেখাইয়া দিয়া একজন সিপাহী বলিল—"ঐ কালাপানীর জেল, ঐখানে তোমাদের থাকিতে হইবে।"

জাহাজ আসিয়া বন্দরে লাগিল ডাক্তার আসিয়া সকলকে পরীক্ষা করিয়া গেল। তাহার পর ডাঙ্গায় নামিয়া আমরা বিছানা মাথায় করিয়া বেড়ী বাজাইতে বাজাইতে জেলের দিকে রওনা হইলাম।

জেলের মধ্যে ঢুকিবামাত্র একজন স্থূলকায় খর্ব্বাকৃতি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আমাদের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"So, here you are at last. Well, you see that block yonder. It is there that we tame lions. You will meet your friends there but mind you don't talk."

(এই যে এসেছ! ঐ দেখছো বাড়ীটা, ঐখানে আমরা সিংহদের পোষ মানাই। ওখানে তোমার বন্ধুদের দেখতে পাবে, কিন্তু খপরদার, কথা ক'য়ো না)।

আমরাও শ্বেতাঙ্গটীকে একবার চক্ষু দিয়া মাপিয়া লইলাম। লম্বায় ৫ ফুট, আর চওড়ায় প্রায় ৩ ফুট। মোট কথা একটী প্রকাণ্ড কোলা ব্যাঙকে কোট পেণ্টুলান পরাইয়া মাথায় টুপি পরাইয়া দিলে যেরূপ দেখায়, অনেকটা সেই রকম। তখনি জানিতাম না যে ইনিই মহামহিম শ্রীমান্ ব্যারী, জেলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তাঁহার বুলডগের মত মুখখানি দেখিলে মনে হয় যে কয়েদী তাড়াইতে যাঁহাদের জন্ম, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ভগবান নির্জ্জনে বসিয়া ইঁহাকে কালাপানি জেলে কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্যই গড়িয়াছিলেন। ইঁহাকে দেখিলেই Uncle Tom's Cabinএর লেগ্রিকে মনে পড়ে।

ভবিষ্যতে ইঁহার সহিত ভাল করিয়া পরিচিত হইবার অবসর পাইয়াছিলাম, কেন না প্রায় এগার বৎসর ইঁহার অধীনে এই জেলে বাস করিতে হইয়াছিল।

ইনি রোমান ক্যাথলিক আইরিস। সারা বৎসর কয়েদী ঠাঙ্গাইয়া যে পাপের বোঝা তাঁহার ঘাড়ে চড়িত, তাহা যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে গির্জ্জায় গিয়া পাদরী সাহেবের পদপ্রান্তে নামাইয়া দিয়া আসিতেন। বৎসরের মধ্যে ঐ এক-দিন তিনি শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি ধরিতেন; সে দিন কোন কয়েদীকে তাড়না করিতেন না; আর বাকি ৩৬৪ দিন মূর্ত্তিমান যমের মত কয়েদী তাড়াইয়া বেড়াইতেন।

কয়েদীদের স্বভাবের মধ্যে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি যে দুর্দ্দান্ত লোক-দিগের প্রতি তাহারা সহজেই আকৃষ্ট হয়, এবং এইরূপ লোকদিগেরই সহজে বশ্যতা স্বীকার করে। ব্যারী সাহেবের নিকট প্রহার খাইবার পর অনেক কয়েদীকে বলিতে শুনিয়াছি—"শালা বড় মরদ হৈ।' যাহারা ভাল মানুষ তাহারা কয়েদীদের মতে স্ত্রী জাতীয়। কয়েদীরা কোন কুকার্য্য করিয়া ভগবানের নাম করিয়া ক্ষমা চাহিলে ব্যারী বলিতেন—"জেলখানা আমার রাজ্য; এটা ভগবানের এলাকাভুক্ত নহে। ৩০ বৎসর ধরিয়া আমি পোর্ট-ব্লেয়ারে আছি; একদিনও এখানে ভগবানকে আসিতে দেখি নাই।"—ব্যারী সাহেবের মুখের কথা হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

জেলে ঢুকিলে প্রথমেই নজরে পড়ে বহু জাতির সমাবেশ। বাঙ্গালী, হিন্দু-স্থানী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বর্ম্মী, মাদ্রাজী সব মিশিয়া খিচুড়ী পাকাইয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান; বর্ম্মীও যথেষ্ট। ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় হিন্দুর এক চতুর্থাংশ কিন্তু জেলখানায় হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান কি করিয়া হইল তাহা স্থির করিতে গেলে উভয় জাতির একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মদেশে লোকসংখ্যা মোট এক কোটি; অর্থাৎ সমস্ত বাঙ্গালীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ; কিন্তু এখানে বাঙ্গালী অপেক্ষা ব্রহ্মদেশীয় লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। খুন, মারামারি করিতে ব্রহ্মদেশীয় লোক বিশেষ মজবুদ। অল্পদিন মাত্র তাহারা স্বাধীনতা হারাইয়াছে সুতরাং ভারতবর্ষের লোকের মত একেবারে শিষ্ট শান্ত হইয়া যায় নাই। হিন্দুস্থান ব্যতীত অন্যদেশের উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুব কম। শিক্ষা-প্রচারের আধিক্য বশতঃই হোক বা প্রকৃতির নিরীহতা বশতঃই হোক মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ একেবারে নাই বলিলেই চলে। আমরা যে সময় উপস্থিত হইলাম তখন জেলখানার মধ্যে পাঠানের প্রাধান্য খুব বেশী। সব জাতিকে একত্র রাখার ফলে যে দুর্ব্বল জাতিদের উপর অযথা অত্যাচার যথেষ্ট হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

দিন কত থাকিতে থাকিতেই দেখিলাম যে জেলখানায় দুর্ব্বলের পক্ষে সুবি-চার পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-সাবুদ দিবার বুকের পাটা কয়েদীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। পরের জন্য নিজের ঘাড়ে বিপদ কে টানিয়া আনিতে যাইবে? যে যার নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাইতেই ব্যস্ত। যাহারা খোসামোদ করিতে সিদ্ধহস্ত, মিথ্যা কথা যাহারা জলের মত বলিয়া যাইতে পারে তাহারাই কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ভালমানুষ এবং তাহারাই প্রভুদিগের প্রসাদ লাভে সমর্থ। আর যাহারা ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা করিয়া অপরের জন্য লড়াই করিতে যায়, তাহাদের অদৃষ্টে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ঘটে; মিথ্যা মোকর্দ্দমার ফাঁদে পড়িয়া তাহারা অযথা সাজা খাইয়া মরে। ফলে জেলখানায় যত কয়েদী আসে, তাহার মধ্যে একজনও যে জেল খাটার ফলে সচ্চরিত্র হইয়া যায় তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

বাস্তবিকই কয়েদীদের ভাল করিয়া তুলিবার চেষ্টা সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষদের মোটেই নাই বলিলে চলে। অসচ্চরিত্র লোকদিগকে সচ্চরিত্র করিয়া তোলা-তেই যে জেলখানার সার্থকতা, সে ধারণাও তাঁহাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। কয়েদী তাঁহাদের কাছে কাজ করিবার যন্ত্র বিশেষ, আর যে অফিসার কয়েদী ঠেঙ্গাইয়া যত বেশী কাজ আদায় করিতে পারে সে তত কাজের লোক; তাহার পদোন্নতি তত দ্রুত।

আর একটা মজার কথা এই যে, সে উল্টা রাজার দেশে মুড়ি মিছরী সব একদর—সব রকম অপরাধের জন্য দণ্ডিত কয়েদীই প্রায় এক রকম ব্যবহার পায়। কঠোর বা লঘু পরিশ্রমের সঙ্গে সব সময় অপরাধের গুরুত্বের বা লঘুত্বের বড় একটা সম্বন্ধ থাকে না। যে সময় কোথাও নারিকেল ছোবড়ার তার (coir) পাঠাইবার দরকার হয় সে সময় সকলকেই ছোবড়া কুটিতে লাগাইয়া দেওয়া হয়, আর যখন নারিকেল বা সরিষার তেলের আবশ্যক হয় তখন একটু মোটাসোটা সকলকেই ধরিয়া ঘানিগাছে জুড়িয়া দেওয়া হয়। সবটাই ব্যবসা-দারী কাণ্ড! কয়েদী সরকার বাহাদুরের গোলাম; আপনাদের দেহের রক্ত জল করিয়া সরকারী কোষাগার পূর্ণ করাতেই তাহাদের অস্তিত্বের সার্থকতা!

অপরাধের তারতম্য অনুসারে কয়েদীকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভূক্ত করিবার প্রথা সরকারী পুঁথিতে আছে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ঘটিয়া উঠে না। কিসে জেলের আয় বৃদ্ধি হয়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চুণো পুঁটি অফিসার পর্য্যন্ত সকলেরই সেই দিকে দৃষ্টি। কয়েদী মরুক আর বাঁচুক, কে

তাহার খবর রাখে? ভারতবর্ষে লোকের অভাবও নাই আর মাসে মাসে জাহাজ বোঝাই করিয়া দরকার মত কয়েদী সরবরাহ করিবার জন্য বিলাতী বিচারকেরও অভাব নাই।

একবার একটি পাগলকে জেলখানায় দেখিয়াছিলাম। বেচারীর বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়; জেলখানায় সে ঝাড়ুদারের কাজ করিত। তাহার নিজের বাড়ীর সম্বন্ধেও তাহার ধারণা অতি অস্পষ্ট; কেন যে সে সাজা পাইয়া কালাপানিতে আসিয়াছে তাহাও ভাল করিয়া বুঝিত না। এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা ক ভাই?" সে উত্তর করিল—"সাত।" তাহাদের নাম করিতে বলায় সে আঙ্গুলের গাঁট গণিয়া পাঁচ জনের নাম করিল। বাকি দুই জনের নাম করিতে বলায় উত্তর দিল—"ভুলে গেছি।" তাহার খাওয়া পরার বড় একটা ঠিকানা থাকিত না; কখনও আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; কখনও বা সারা দিন রাস্তা পরিষ্কার করিয়া বেড়াইত। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে লোকটার মাথা খারাপ। তাহাকে পাগলা গারদে না দিয়া কোন্ সুবিচারক যে তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। এরূপ দৃষ্টান্ত জেলখানায় অনেক পাওয়া যায়।

তবে মাঝে মাঝে দুই একজন এমন ওস্তাদও মিলে যাহারা কাজের ভয়ে পাগল সাজে। একজন বাঙ্গালীকে ঐরূপ দেখিয়াছিলাম। একদিন বেগতিক বুঝিয়া সে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া গান জুড়িয়া দিল। চোখে চুণের সামান্য গুঁড়া লাগাইয়া চোখ দুটা লাল করিয়া লইল; আর আবল তাবল বকিতে আরম্ভ করিল। ভাত খাইবার সময় মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। প্রহরীরা তাহাকে জেলারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। জেলার গোটা দুই কলা আনিয়া তাহার হাতে দিলেন। সে কলা দুটো খাইয়া পরে খোসাগুলাও মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল। জেলার স্থির করিলেন লোকটা সত্য সত্যই পাগল; তা না হইলে খোসা চিবাইতে যাইবে কেন? তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাঁরে কলার খোসা চিবুতে গেলি কেন?" সে বলিল—"কি করি বাবু, জেলার বেটাকে ত বোকা বানাতে হবে! একটু কষ্ট না করলে কি আর পাগল হওয়া চলে?"

তৃতীয় দৃষ্টি

(শ্রীমতী লীলা দেবী)

দম্‌কা ঝড়ের হাওয়া!
নিবিয়ে দিল ঘরের বাতি
চোখে চোখে চাওয়া!
এলিয়ে দিল ঘরের আগল
ঝিলিক্ মারা পাগল বাদল
তাই চোখে নয় সবার প্রাণে
দৃষ্টি এবার পাওয়া!
চোখের ভিতর যে চোখ আছে
সবার ভালে সবার কাছে
সেই খানেতে দৃষ্টি রেখে
জীবন আমার বাওয়া!

"ঋগ্‌বেদের সময় ভারত"।

২

বেদে ভূ-তত্ত্ব ও বৈদিক জনপদ সমূহের স্থিতি নির্দ্দেশ।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হইতেছে ভূ-তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা 'ইলা' ও অন্যান্য জনপদ সমূহের স্থিতি নির্ণয়। ইহা ছাড়াও 'ইলার' স্থিতি নির্দ্দেশ করিবার আর একটী উপায় আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মহাভারতের শাকদ্বীপ আর ইলাবৃত একই স্থানের বিভিন্ন নাম। কেন না শাকদ্বীপেও মেরুপর্ব্বত অবস্থিত আছে, এবং উহাতে দেব, ঋষি ও স্বকর্ম্মনিরত বহু ব্রাহ্মণের বাস। আর ইন্দ্রই সেখানকার রাজা। ঐ শাকদ্বীপে মঙ্গ, মানস, মশক ও মন্দগ, এই চারিটী লোকসম্মত দেশ আছে। এই মঙ্গদেশই বর্ত্তমান মঙ্গোলিয়ার প্রাচীন নাম। মানস হইতেছে আধুনিক মানচুরিয়া। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ১১ অধ্যায়)

ভূ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া বেদ হইতে তথ্য বাহির করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আসিয়া মহাদেশ একটী মহান্ ভূমিখণ্ড, আর ভূ-তত্ত্ববিদেরা এখনও পর্য্যন্ত ইহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া উঠিতে সক্ষম হন নাই। ভূ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আপনাদের সুবিধানুযায়ী পৃথিবীর জন্ম হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমস্ত কালকে পাঁচ মহাযুগে ভাগ করিয়াছেন, যথা—(১) অতি প্রাচীন (Archaean), (২) প্রাথমিক (primary or paleaozoic), (৩) দ্বিতীয়ক (Secondary or Mesozoic), (৪) তৃতীয়ক (Tertiary), এবং (৫) আধুনিক (Quaternary) মহাযুগ। আবার প্রত্যেক মহাযুগকে কয়েকটী যুগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে দ্বিতীয়ক ও তৃতীয়ক মহাযুগের অন্তর্গত যুগ-বিভাগ গুলি জানিলেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

দ্বিতীয়ক (Secondary or mesozoic) মহাযুগ

(১) Triassic (ট্রায়াসিক্)
(২) Jurassic (জুরাসিক্)
(৩) Certeceous (সার্টে সিউস্)

এবং তৃতীয়ক (Tertiary) মহাযুগ

(১) Eocene (অয়োসিন্), (২) Oligocene (অলিগোসিন্) (৩) Miocene (মায়োসিন্), (৪) Pliocene (প্লায়োসিন্) (৫) Pliestocene (প্লিষ্টোসিন্)।

ভূ-তত্ত্বের আলোচানায় দেখা যায় সে প্রাথমিক মহাযুগের পূর্ব্বে সমস্ত আশিয়া মহাজনপদ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে দ্বিতীয়ক যুগের শেষ ভাগে উত্তর পূর্ব্ব আশিয়ার অনেকটা ভূমি স্থলে পরিণত হইয়াছিল। দক্ষিণ সাইবেরিয়ার কতক অংশ, সমস্ত মঙ্গোলিয়া, মানচুরিয়া ও চীনের কতক অংশ এবং চীনীয়-তুর্কিস্থানের উত্তরাংশ এই ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিম্নে Encyclopaedia (Britanica Edition) হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, "There is positive evidence that much of north and east of Asia has been land since the Palaeozoic or Primary era……The Triassic deposits of the Yerkhoyansk range show that this land did not extend to the Bering sea, while the marine deposits of Japan on the east, the western Tian-

shan on the west and Tibet on the south give us some idea of its limits in other directions." (P. 768, Vol. 2). এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভূ-তত্ত্ববিদেরা এখনও অসংশয়ে বলিতে সক্ষম নহেন যে এই ভূমিখণ্ডের বিস্তৃতি কতখানি, আর তাঁহারা ইহার যথার্থ সীমা নির্দ্দেশও করিতে পারেন নাই। যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার অধিকাংশই মতবাদ মাত্র। ঐ সকল মতবাদ এখনও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই।

এই সময়ে অন্যান্য সমস্ত স্থানই জলমগ্ন ছিল। কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশ স্থলে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু অসংশয়ে বলা যায় না এই ভূমিখণ্ড মঙ্গোলিয়া ভূমিখণ্ডের ঠিক সমসাময়িক কিনা। এই দুই ভূমিখণ্ড প্রাচীনত্বে এক হইলেও আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত ইহার কোনও বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ এই দুই স্থানের মধ্যে সাগরের এত বেশী ব্যবধান ছিল যে সেই প্রাচীন কালে মঙ্গোলিয়া নিবাসী দেবগণের পক্ষে এই দ্বিতীয় স্থানের অস্তিত্বজ্ঞান থাকা অসম্ভব। তত্রাচ মঙ্গোলিয়া ভূমিখণ্ডই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়।

হিমালয়-পার্ব্বত্য-প্রদেশ ও উত্তর ভারতের কতক অংশ প্রাচীনত্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পূর্ব্ব আফ্‌গানি স্থান (গান্ধার) ও বল্ক প্রদেশ (বহ্লিকদেশ) ইহারই অন্তর্গত ছিল। হিমালয় প্রদেশ Eocene (আয়োসিন্) যুগে উত্থিত হয়, আর উত্তর ভারতের পশ্চিমাংশ তৃতীয়ক মহাযুগের মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ করে। আফ্‌গানিস্থানের পশ্চিমাংশ ও পারশ্যদেশ আধুনিক (Quaternary) যুগের প্রথম ভাগে স্থলে পরিণত হয়। বেলুচিস্থান আরও পরবর্ত্তী যুগের। এই সম্বন্ধে Encyclopaedia হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, "Persia consists of a central region covered by Quaternary deposits and bordered on the north, west and south by a raised rim composed of older rocks. These older rocks form the isolated ranges which rise through the Quaternary deposits of the central area." আবার, 'The Miocene deposits generally lie at the foot of the chains, or in the valley…… Pliocene deposits cover a considerable area near the coast. Both in the Elburz range and near Baluchistan frontier there are numerous recent volcanoes. Some of these seem to be

extinct but several continue to emit vapour and gases. (P. 190 bc, Vol. 21).

আবার সাইবেরিয়ার উত্তর অর্দ্ধাংশ আধুনিক (Quaternary) মহাযুগের প্রথমভাগে কিম্বা আরও পরে স্থলে পরিণত হয়। কারণ যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইহা তৃতীয়ক মহাযুগ পর্য্যন্ত জলমগ্ন ছিল। "This vast tract, only a few dozen feet above the sea, most probably was covered by the sea during the post-pliocene (Pleistocene) period. It stretches from the Aral-caspian depression to the low-lands of the Tobal, Irtysh, and Ob, and thence towards the Yenisei and Lena." (P. 11d.—Vol. 25).

এইবার আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে বেদে এই সকল বিষয়ের কি প্রমাণ আছে। বেদে আমরা স্বঃ (ইলা, দ্যৌ, বা যজ্ঞ), ভূ (ভারত, পৃথিবী), ভুব (অন্তরীক্ষ, সমুদ্র, আপ), ও দিব্, এই চারিটী জনপদের উল্লেখ দেখিতে পাই। 'স্ব' ও 'ভূ' কোন্ কোন্ দেশ তাহা মোটামুটি পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি। যদিও পুরাণ প্রণেতারা ও অনেক ভাষ্যকারের ভ্রমবশতঃ 'অন্তরীক্ষকে' শূন্য আকাশ বলিয়াছেন, তথাপি বেদে ও ব্রাহ্মণে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে অন্তরীক্ষ একটি জনপদ ও মনুষ্যের বাসস্থান। আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখিতে পাই সে 'অন্তরীক্ষ' ভুবর্লোকের আর একটী নাম (ভুব ইতি অন্তরীক্ষম্)। সায়ণও স্বকীয়ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে 'পৃথিবী'র ও 'দ্যোব' মধ্যস্থলে যে লোক তাহাই 'অন্তরীক্ষ' (১৬৭ পৃ, ও ৬২৪ পৃ, প্রথমখণ্ড অথর্ব্ববেদ)। 'অন্তরীক্ষের' অর্থ যে 'সমুদ্র' তাহাও সায়ণ বলিয়াছেন (১৮।৩০।১, ঋক্)। 'অন্তরীক্ষ' আবার তিনটী (ত্রিরন্তরিক্ষম্, ৫।৫৩।৪, তৈঃ ব্র)—যথা, (১) অলোগস্থান, (২) অর্য্যায়ণ (Iran), (৩) অসুরীয় জনপদ (প্রাচীন আসিরিয়া)। আবার ভারত হইতে ইলায় যাইবার জন্য পুরাকালে অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া সুন্দর সুন্দর পথ নির্ম্মিত ছিল। ঋগ্‌বেদে (১১।৩৫।১) আমরা দেখিতে পাই যে অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া সবিতৃদেব নির্ম্মিত যে সকল পথ আছে, তাহা অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত ধূলি পরিশূন্য। অন্তরীক্ষের আর একটা নাম পৃশ্নি (১।৬৬।৩, ঋক্, সায়ণ শিষ্য)। আর সায়ণ বলিতেছেন, পৃশ্নি ইন্দ্র সৈনিক মরুদ্‌গণের মাতৃভূমি (১০।২৩।১, ঋক্)।

ইলার উত্তরে যে দেশ তাহারই নাম দিব্। দিব্ চারিটী যথা—সত্যলোক

অহর্লোক, রাত্রিলোক, ও সংবৎসর লোক। অনেক ভাষ্যকারেরা এই সত্যলোকের অর্থ সত্য কথন, আর অহ, রাত্রি ও সংবৎসর জনপদদিগকে কালপদবাচ্য বলিয়া স্থির কয়িয়াছেন। পরন্তু সত্য অর্থে যদি এখানে সত্যকথন বুঝায়, এবং অহ, রাত্রি ও সংবৎসর রদি কালপদবাচ্যই হয়, তাহা হইলে তাহাদের একে একে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থানের কথা 'বেদে' লিখিত থাকিবে কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না (১।১৯০।১০, ও ২।১৯০।১০, ঋক্)। ইহারা যে জনপদ তাহা ঋগ্বেদে ও অনেক ব্রাহ্মণগ্রন্থে বেশ স্পষ্ট করিয়াই লিখিত আছে। ঋত ও সত্যের এক অর্থ সত্যকথন। ইহাদের আর এক অর্থ সত্যলোক। যথা,—ঋগ্বেদে যাহারা সত্যলোকে বাস করিয়া থাকে তাহারা সত্যলোকবাসী (৫।৪০।৪)—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৪৯৫ পৃ ও ৪৯৬ পৃ)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৪৪৫ পৃষ্ঠায় আছে যে পরস্পর বিবদমান দেবতারা অহর্লোক ও অসুরেরা রাত্রিলোকে আশ্রয় করিলেন। আবার, অসুরেরা ভ্রাতৃব্য দেবগণকে অহর্জনপদ প্রদান করিলেন (৬৩৯ পৃ ঐ)। সংবৎসর দেবতাদিগের অধিকৃত একটী দেশ, উহা অসুরেরা জয় করিয়াছিলেন। পরে দেবতারা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া পুনরায় অধিকার করেন (৯৯ পৃ, কৃষ্ণযজু)। দ্বাদশ মাসে এক সম্বৎসর হয়; ইহা ভিন্ন আরও একটী সম্বৎসর আছে। উহা দেবতাদের একটি পুরী (৩১৬ পৃ, তৈঃ ব্র)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও আছে যে বারমাসে এক সংবৎসর, আর প্রজাপতি চন্দ্রের (আকাশের চাঁদ নহে, এই চন্দ্র প্রজাপতি চন্দ্র-বংশের আদি পুরুষ) একটি আয়তনের নামও সংবৎসর (৬০ পৃ)।

এইবার আমরা দেখিব কোন্ স্থান কত প্রাচীন; আর কোন্ স্থানই বা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ঋগ্বেদে (১।৫৫।৪) বিবৃত আছে যে মহতী 'দ্যৌ' ও 'পৃথিবী' জগতের সকল জনপদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা বর্ষীয়সী। আর এক স্থলে, এই দ্যাবা পৃথিবী অতি বিস্তৃত বাসস্থান ও ইহারা সকলের অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিল (৮।৬৫।১০)। ইহা হইতে বুঝা গেল যে 'দ্যৌ' ও পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ভূমি। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে যে ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর? ঋগ্‌বেদের একজন ঋষিই এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন, 'দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে কোন্‌টী পূর্ব্বে উৎপন্ন, আর কোন্ স্থানই বা পরে উৎপন্ন হইয়াছিল? (১।১৮৫।১ম, সায়ণ ভাষ্য)। পিতা (পিতৃভূমি দ্যৌ) সকল স্থানের মধ্যে প্রাচীনতম' (৩।৭৩।৯, ঋক্)। আর আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধের এক স্থলে দেখিয়াছি যে, যে জলরাশি প্রথমে সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছিল সে আপন মহিমায়

'যজ্ঞ' জনপদকে জন্মপ্রদান করিল। তাহা হইলে দেখাগেল ইলা, দ্যো, বা যজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম।

প্রাচীনত্বে দ্বিতীয় পৃথিবী বা ভারত (উত্তর ভারতের কতক অংপ, কারণ অতি পুরাকালে ভারতের অন্যান্য অংশ জলমগ্ন ছিল), আর অন্তরীক্ষ তৃতীয়। আমরা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই যে পুরাকালে কেবলমাত্র দ্যাবা পৃথিবী ছিল, তখন উহাদের মধ্যে অন্তরীক্ষ জনপদ ছিল না (১৬ পৃষ্ঠা—সায়ণ ভাষ্য)। তৎপরেই পশ্চিম মহাসাগর গর্ভে সমুদ্র বা অন্তরীক্ষের উৎপত্তি হয় (১।১৯।১০, ঋক)। এই অন্তরীক্ষে বরুণ রাজত্ব করিতেন (৫।৮৫।৫, তৈঃ, ব্র)। আর এই বরুণই পার্সিদের 'অহুরমজ্‌দা'। পুরাণ প্রণেতারা সমুদ্র জনপদকে সাগর ভাবিয়া বরুণকে জলদেবতায় পরিণত করিয়াছেন। অসুরেরা (বৃত্র ও বল) ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্তরীক্ষে উপনিবেশ স্থাপন করে (১৩।৬।৮ম, ৮।১৪।৮, ও ৫।৬।১ম, ঋক্)। বৃত্র পারস্যে 'আয্যায়ণ' (পরে আইরাণ বা ইরাণ) জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন। বৃত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'বল' অসুরীয় (পরে assiryan) সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই বলই আসিরিয়ার বেল বা বিলুস্। *

অন্তরীক্ষ সৃষ্টি হইবার সময়েই সত্য ও রাত্রিলোক স্থলে পরিণত হয় (১।১৯০।১০, ঋক)। তারপরই সংবৎসর ও অহর্লোক সমুদ্র গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয় (২।১৯০।১০, ঋক)।

অতএব ভূতত্বের আলোচনা দ্বারাও প্রমাণিত হইল যে ইলাই মঙ্গোলিয়া ভূমি খণ্ড, পৃথিবীই ভারতবর্ষ, অন্তরীক্ষ পারশ্য ও তুর্কি, এবং দিব্‌ সাইবেরিয়ার অধিকাংশ প্রদেশ। আমরা ঋগবেদে (১।১০।২ ও ১০।৪৫।১) আরও দেখিতে পাই যে অগ্নি প্রথমে দ্যোতে, পরে ভারতে ও তৎপরে অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত হয়। ইহা হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে আর্য্যমানব প্রথমে দ্যোতে বাস করিতেন, পরে ভারতে আসেন, এবং ভারত হইতে অন্তরীক্ষে গমন করেন।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আর্য্যেরা তাঁহাদের ভারতের বাসস্থানকে কেন 'দেবনির্ম্মিত-দেশ' বলিয়াছেন, সেই বিষয়ে আলোচনা করিয়া সমালোচনা শেষ করিব।

---

* পার্সিদের জেন্দ আভেস্তা পড়িলেই বুঝা যায় ইহা দেবদ্রোহী অসুরের প্রণীত। তাহাদের আর্য্যাণেম্‌ বৈজো আমাদের 'আর্য্যাণ বর্ত্ত' (আর্য্যাবর্ত্ত) ছাড়া আর কিছুই নহে। আরও দেখা যায় যে আভেষ্টার লেখক অঙ্গরামৌনকে (Angra Mauna) অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এই অঙ্গরামৌন বেদের অঙ্গিরস্ মুনি। বেদে এক স্থলে দেখা যায় যে অসুরেরা (বিলু ও তাহার অনুচরেরা) অঙ্গিরাগণের গাভী প্রায়ই হরণ করিয়া লইয়া যাইত (৫ ৬।১ম ঋক্)॥

অশান্তি।

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী]

তবু ঝরিল না প্রাণ।
একে একে জীবনের বসন্ত, নিদাঘ,
বরষা, শরৎ ঋতু স্নিগ্ধে শ্যামরাগ
লয়ে হ'ল অবসান;
তবু ঝরিল না প্রাণ।
হিমের কুয়াসা আজ চৌদিকে আঁধার
ঘিরেছে—দেখি না পথ—সবি একাকার—
ভয়েতে আকুল প্রাণ;
তবু ঝরিল না প্রাণ।
শিথিল জীবন বৃন্ত পীত জরাতুর
ঝরিয়া পড়িতে চায় মৃত্যু নহে দূর,—
ওই এসেছে আহ্বান—
তবু ঝরেনাক প্রাণ।
নাহি রূপ নাহি গন্ধ নাহি কোনো কাজ
এসেছে অতিথি নব পরি নব সাজ;
ছাড়িতে চাহি যে স্থান—
তবু-ঝরে নাত প্রাণ।

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ।

সহজিয়া।

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।]

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৭

কিন্তু আমার এই বিফল পূজার পূর্ণ ফলও যে একজন নিজে বয়ে এনে দিচ্ছে, তার কথা যেন বলতে না ভুলি। সে কে? সে দয়াময়ী হাসিদেবী—বিশ্বের হাসির প্রতীক নয়, একেবারে জমাট প্রতিমা, বিশ্বলক্ষ্মীর মূর্ত্তি বিগ্রহ! এ যে কেন এমনি ভাবে আমার মায়ের আড়াল হতে আমাকে ঘিরে ফেল্‌লে তা যে বুঝতে পারছি নে। তা কি কেউ তোমরা বুঝিয়ে দেবে? আমার স্বর্গগত মালিকের মহা বৈরাগীর সংসারে এমন লক্ষ্মীর পদ্মাধারটি কি করে ফুটলো কে ফোটালে? কার জন্যে ফোটালে?

কার জন্যে ফোটালে? আমারি জন্যে—আমারই জন্য যার আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল সেই ফোটালে; যার বিশ্বমানসে প্রত্যেকের জন্য সবের, সবারই জন্যে প্রত্যেকের জন্ম হয় তারই এই কারসাজী। কিন্তু কারসাজী ধরা পড়ে যাচ্ছে। এইটেই সেই চিরন্তনী বোকা মেয়ে বুঝি বুঝছে না।

বুঝছে না? তাই বা কেমন করে হবে? সে যদি না বোঝে ত' এই হাসিই বা কি করে সব বুঝে ফেলে। আমার কি চাই, কোন্ সময় কোন্ মুহূর্ত্তে কি দরকার তা সবই কি করে এ বুঝলে? আমার ঘরখানা কি করে ঠিক এমনি ভাবে মন ভুলান হয়ে উঠ্‌ল। এমন সব ছবি—এমন ফুলের অর্ঘ্য, এমন বিচিত্র মালা, এমন সব রঙ্গিন খেলনায় কেন আমার ঘরখানা ভরে উঠল!

আবার ঐ অত শোভার সম্ভারের মাঝখানে এমন একটা ভিখারীর ছবিকে এমনি ভাবে শ্বেত পাথরের হোয়াট্‌নটের ওপর গোলাপ আর পদ্মের মালার ফ্রেমে কেন সে বসিয়ে দিয়েছে? এই এত রূপের, এত আলোর মাঝখানে ঐ ভিক্ষাপাত্র হাতে জগদেক-ভিখারী বুদ্ধদেবকে কেন সে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে? সে কি প্রায় প্রথম দর্শন হতেই টের পায়নি? সে কি না জেনেও জানে নি?

যে অমনি করে তাদেরই দ্বারে এই হতভাগা কামুকটা পতিত মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে?

সে টের পেয়েছে ভাই, অনেক আগেই টের পেয়েছে, কারণ সে সবারই সব খোঁজ রাখে, যার কাছে কিছুই হারায় না সে সর্ব্বনাশী সর্ব্বলোলুপাই যে এই মানুষটির প্রাণের মধ্যে, মনের মধ্যে ঢুকে এর অন্তর বাহির সবটুকুকে তাতিয়ে রাঙ্গিয়ে ভরিয়ে ভরিয়ে তুলছে।

কিন্তু আমি কবে এবং কি করে এ কথা জানতে পারলাম? সে একটা গোপন কথা—তবু বলতে হবে? আচ্ছা বলছি। আমার মধ্যে যে একটুও আড়াল রাখতে দেবে না তোমরা, তা জানি, আমার সব অহংকার যে তোমরা ধুলোয় মিশিয়ে দেবে তা আগেই বুঝতে পেরেছি। তবে শোনো—

আমার একখানা ফটোগ্রাফ ছিল, ঠিক আমার নয় আমাদের তিন জনের। আমার যিনি সেই যোগীগুরু—মন্ত্রগুরু জ্ঞানগুরু তিনি, আর আমার হিমালয়ের সেই বন্ধু সাথী সখা এবং কর্ম্মগুরু সেই তুরিয়ানন্দ স্বামী আর এই অধম মানুষটার তখনকার চেহারার ফটোগ্রাফ আমার গুরুদেবের এক শিষ্য তুলে আমাদের তিন জনকে দিয়েছিলেন। আমি তা যত্ন করে ঝোলায় রেখেছিলাম, এবং এখনো ওটা রেখেছি। কেন? তা কি বলতে হবে। এই শরীরটার ওপর, এই বিকশিত আমিটার ওপর চিরদিনই আমার বোধ হয় লোভ ছিল। তাই রেখেছিলাম—ফেলিনি।

কিন্তু ফটোগ্রাফখানা বেরুল কি করে, তা ঠিক বুঝাতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে আমার জিনিষপত্র ঘাঁটা মার যেমন একটা কাজ হয়েছিল, বোধ হয় হাসিদেবীরও একটা কাজ হয়েছিল। আমি যখন ষ্টেটের কাজে বাইরে থাকতাম, তখন এই দুটি নারী-হৃদয় আমাকে নিয়ে কি যে করত তার সঠিক খবর আমি দিতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে মা আমার সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া যা কিছু বলবার সবই বলে ফেলেছিলেন। এবং সেই আমার যেটুকু অংশ ধরা পড়েছিল তা নিশ্চয়ই এই অদ্ভুত নারীর মনে এমন একটা আকর্ষণ করেছিল যাতে এই সেবাপরায়ণাকে আমার জন্য অনেক সময় ভাবিয়ে তুলত।

সেই ভাবনাকে মূল করে এই ফটোখানার ওপর সেদিন মার সঙ্গে তাঁর তর্ক হচ্ছিল। আমি তখন সবেমাত্র কাছারী হ'তে ফিরে মার কাছে উপস্থিত হয়েছি। আমাকে দেখে তাঁদের তর্ক থেমে গেল। হাসি তাড়াতাড়ি ফটোখানি লুকালে।

মা কিন্তু সে লুকোচুরী রাখতে দিলেন না—ফটোখানা কেড়ে নিয়ে বল্লেন, 'প্রিয়, তোর বাক্সে এ কাদের ফটো রে?'

আমি চমকে বল্লাম, 'কৈ দেখি।' ফটোখানা হাতে পেয়েই আমার হাত কাঁপতে লাগল—আমি বল্লাম, 'কেন বল ত? এদের কি তোমরা চেন নাকি?'

মা বল্লেন, 'আমি ত' একজনকেও চিনতে পারছি নে, তবে এই মানুষটার মুখ যেন চেনা চেনা মনে হচ্চে।'

'কার মত মনে হচ্চে?'

'যেন তোরই মত।'

আমার মুখটা তখন কি রকম হয়েছিল বলতে পারি না কিন্তু বুকের মধ্যে যে একটা তোলপাড় চলছিল সেটা গোপন করব না। আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম, 'হলেই বা আমার মত, আমিই যে তা ত জোর করে বলতে পার না!'

মা দেখে দেখে বল্লেন, 'না, তা ঠিক বলা যায় না।'

আমি হাঁফ ছেড়ে বল্লাম, 'ও আমার তিনটি চেনা লোকের ছবি। কিন্তু এটা তোমরা পেলে কোথায়?'

মা এইবার ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, 'তোর বাক্সর মধ্যেই পেয়েছি। বাক্স গোছাতে গিয়ে—'

আমি একবার হাসির মুখেরদিকে চাইলাম তারপর বল্লাম, 'তা বেশ করেছ, তাতে আর এত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে কেন? এখন দাও ওখানা রেখে দিই—ওদের তোমরা চেন না; কি করে চিনবে?'

এইবার হাসি কথা কইলে, বল্লে, 'আমি কিন্তু ওর মধ্যে দু জনকে অন্ততঃ ধরতে পেরেছি বলে মনে হয়।'

আমি প্রাণপণ বলে জোর করে বল্লাম, 'আপনি ত' আর কালিদাস নন যে বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী ভানুমতীর তিলটী হ'তে বনের বাঘ ভালুকের কথা পর্য্যন্ত বলতে পারবেন। আপনাদের বাড়ীতে বহুদিন হ'তে সন্ন্যিসী মহারাজরা যাতায়াত করছেন, হয়তো কারুর সঙ্গে এদের মুখের সাদৃশ্য আছে। তাই বলে এরাই যে তারা তার কোনো মানে নেই, অন্ততঃ একটীর বিষয় আমি ঠিক জানি যে কথনো তাকে দেখেন নি।'

হাসি বল্লে, 'কোন্‌টীর বিষয় শুনি?' আমি আমার চেহারাটা দেখিয়ে বল্লাম 'অন্ততঃ একে কখেনো দেখেন নি।'

'কি করে জানলেন?' আমি জেরায় পড়ে জব্দ হবার মত হলাম, তবু

সাহসে ভর করে বল্লাম 'আমার ইনি খুব চেনা লোক, ইনি কখনো এখানে আসেন নি তা জানি।'

হাসি হাসিহীন মুখে উজ্জ্বল চোখে একবার আমার দিকে চাইলে, তারপর বল্লে, 'ঠিক জানেন আসেন নি?'

আমি বল্লাম, 'ঠিক জানি, ইনি, ঠিক ইনিই, কখনো আসেন নি। আপনি কেন বিশ্বাস করছেন না—'

আমার কথা শেষ হ'তে না দিয়ে হাসি বল্লে, 'বিশ্বাস করা না করা ত' আমার হাত নয়। যাক, ও নিয়ে তর্ক করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই আর একটী লোককে যে আমি দেখেছি এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম, 'সে কি! কবে দেখেছেন? কোথায় দেখেছেন?'

'এইখানে, ঘণ্টা দুই আগে।'

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। হাতের ফটোখানা যে কি জোরে কাঁপতে লাগল তা বলতে পারিনে। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সামলে নিয়ে বল্লাম, 'ইনি এইখানেই আছেন, আর আমি জানি নে! আশ্চর্য্য!'

হাসি এইবার হেসে উঠলেন, কিন্তু সে হাসিটা যে ঠিক হাসির মত শুনিয়েছিল তা যেন মনে হল না। হাসি বল্লে, 'আপনি অনেক খোঁজই রাখেন না, যাক আপনার এক বন্ধুর খোঁজ দিলাম যদি দেখা করতে চান ত' বড় বাগানে গিয়ে দেখা করে আসবেন।'

মা এতক্ষণ চুপ করে এই প্রগল্‌ভা রমণীর কথা শুনছিলেন। কি যে তাঁর মনে হচ্ছিল জানি না, কিন্তু আমি যে খুব একটা মুস্কিলে পড়েছি তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাড়াতড়ি বল্লেন, 'সাধু দর্শন! সে তো খুব ভালকথা, আজই আমায় নিয়ে চল না মা আমি দেখে আসি। প্রিয় যখন সময় পাবে যাবে এখন, এখন ওর জলখাবারটা এনে দিই, তুমি দাঁড়াও।'

হাসি কিন্তু দাঁড়াল না; বল্লে, 'না মা এখন নয়, দিদি হয়ত আমায় খুঁজছে, তার সন্নিসী পূজোর সময় উত্তীর্ণ হচ্ছে, আমি যাই, কাল আপনাকে নিয়ে যাব।'

হাসি চলে গেল—মাও বেরিয়ে গেলেন, আমি কেবল অবাক হয়ে যে পথে ঐ অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান করলে সে দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম।

(ক্রমশঃ)

উপাসনা।

উর্দ্দু ও বাঙ্গালা সাহিত্য

অনেক দিন হইতে দেশে কেবলই একটা কলহ বিবাদ চলিয়া আসিতেছে—আমাদিগকে কোন্ সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মায়ের ভাষা ছাড়া কোন ভিন্ন জাতির ভাষাকে যদি আপনার করিয়া লওয়া সম্ভব হইত তবে আমি দেশবাসীকে কহিতাম, তোমরা উর্দ্দু বাঙ্গালা সব ভুলিয়া আরবীকে মাতৃভাষায় পরিণত করিয়া লও। কিন্তু তাহা যে একেবারেই অসম্ভব। এক আত্মার পক্ষে অন্য শরীরে প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, কোন জাতির পক্ষে নিজেদের গৃহের ভাষা ভুলিয়া ভিন্ন দেশের ভাষাকে আপনার করিয়া লওয়াও তেমনই অসম্ভব।

কল্পনা করুন, যদি সমস্ত বিশ্বের মোসলমান জাতির ভাষা আরবী হইত, তাহা হইলে এসলামের বিরাট দেহে যে শক্তি সঞ্চিত হইত তাহার সম্মুখে কি কেহ দাঁড়াইতে পারিত? দুঃখের বিষয় এই কল্পনা কখনও কার্য্যে পরিণত হইবার নয়।

শিশু বয়স হইতে কত সুখ ও দুঃখের কথা, কত স্নেহ মায়ার প্রকাশ, কত স্মৃতি, কত প্রার্থনা, কত পরিচিত প্রাণ, কত হাসি, কত হারাণ কণ্ঠস্বর যে ভাষার সহিত জড়াইয়া আছে, তাহা কি ভোলা যায়? তাহা ভুলিলে আমার যে কিছুই থাকে না। আমি ভিখারী হইতে পারি, দুঃখ-অশ্রুর কঠিন ভারে চূর্ণ হইতে আপত্তি নাই। আমি মাতৃহারা অনাথ বালক হইতে পারি—কিন্তু আমার শেষ সম্বল—ভাষাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমার ভাষা চুরি করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিও না।

দুঃখের দাবদাহে যখন আমার বক্ষ পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন আমি মাতৃভাষায় সান্ত্বনার গীত গাই, যখন প্রবাসে: দুঃখ-ক্লেশের মাঝে সংসারকে নিতান্তই অনাত্মীয় বলিয়া মনে হয়—তখন দিগন্তের বাতাস আমার আমারি ভাষায় কত প্রীতির কথা বলিয়া যায়। আমার হারান প্রিয়তমার মুখখানি কতবার নিশীথে আমার বাতায়ন পাশে আসিয়া, আমারি ভাষায় আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া যায়। প্রকৃতির শ্যাম মাধুরী, বিশ্ব জোড়া আলোক, বাতাসের হাসি, শ্রাবণের বর্ষাধারা, কালমেঘের অসীম আবেগ কাহার ভাষায় অনন্তের সঙ্গীত শোনায়?

আমার ভাষা কাড়িয়া লইয়া আমাকে দরিদ্র করিও না।

মাতৃভাষাকে কেমন করিয়া ভুলিব? এমন অসম্ভব প্রস্তাব করিয়া আমার

জীবনকে অসাড় ও শক্তিহীন করিয়া দিতে চায়—কে? বিদেশী ভাষায় কাঁদিবার জন্য কে আমাকে উপদেশ দেয়?

মাতৃভাষার সাহায্যে মানুষের কল্যাণ যত দ্রুত হয় এমন আর কিছুতে হয় না। বিদেশী ভাষায় দুষ্কারজনক অসরলতা ছাড়িয়া মাতৃভাষার ভিতর দিয়া সহজ ও সরল করিয়া দেশবাসীকে মহত্ত্ব ও জীবনের পথে উদ্বুদ্ধ কর, দেখিবে কত সহজে সে তোমাকে সাড়া দেয়।

গৃহের পার্শ্বে উর্দ্দুর কলহাসি আমরা নিত্যই শুনি কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালী মোসলমানের হৃদয় তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনি জাগে না। সে তাহাতে যথার্থ আনন্দ ও শান্তিলাভ করে না। বহু লোককে উর্দ্দুর জয়গান গাহিতে শুনিয়াছি,—তাঁহারা বলেন—উর্দ্দুর ভিতর এসলামের যে সম্পদ রহিয়াছে বাঙ্গালায় তাহা নাই। এতদিন বাঙ্গালী মোসলমান বাঙ্গালা ভাষার সেবা করে নাই। বহু সাধকের সাধনা সে পায় নাই—তাহার এ দীনতার জন্য সে নিজে দায়ী নহে।

উর্দ্দুর ভিতর এসলামের অনেক সম্পদ রহিয়াছে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু সে সম্পদ লৌহ কীলকাবদ্ধ হীরক স্তূপের মত নিরর্থক হইয়া আছে। সে সম্পদে মানুষের কোন কল্যাণ হইয়াছে কিনা জানি না। অনুবাদ ও প্রাণ-হীনতার নির্দ্দয় চাপে সারা উর্দ্দু সাহিত্যটা একটা মরু মাঠের মত অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। উহাতে একটু জল পাওয়া যায় না। উহাতে ঈশ প্রেমের যথেষ্ট ছড়াছড়ি আছে,—কিন্তু স্নেহ সহানুভূতির ক্ষীণ পরশ নাই! উহাতে দাসজীবনের অবনত মাথা আছে,—স্বাধীন চিত্তের সরল সহজ প্রীতি গন্ধ নাই।

যাঁহারা উর্দ্দু বলিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে আমার বিশ্বাস চিত্তের প্রসারতা ও দৃষ্টির খুব অভাব। উর্দ্দু সাহিত্য নিজের প্রিয়তমাকে লইয়া নির্জ্জনে প্রেমালাপ বা কাঁদাকাঁদি করিলেও উহা মানব হৃদয়ের ব্যথা বেদনার কোন খবর রাখে না। মানুষকে সুক্ষ্মভাবে ভাবের স্পর্শ দিয়া আঘাত করিবার সার্থকতা স্বীকার করে না—ইট সুরকীর কথা না ভাবিয়া ইমারত গড়িবার দুরাশা সে রাখে। যে মানব হৃদয় লইয়া জাতির বিরাট হৃদয় গঠিত—তাহাকে সে একেবারেই বাদ দেয়।

কলিকাতার নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোক উর্দ্দুভাষী—ইহাদের স্বভাব প্রকৃতি হিংস্র জন্তুরই সমান। উর্দ্দু সাহিত্যে যদি এমন কোন শক্তি না থাকে যাহার স্পর্শে আসিলে মানুষের আত্মবোধ জন্মে, সে তাহার জীবনের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে, তবে সে সাহিত্যের সার্থকতা কোথায়? শুধু

নিম্ন শ্রেণী বলিয়া কথা নহে, উর্দ্দু ভাষী উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যেও সাধারণতঃ স্নেহ-সহানুভূতি ও কোমল স্বভাবের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। জীবনের উচ্চ রকমের সার্থকতার কোন খবর ইহারা রাখেন না, দুই একজন আত্মীয়, মাতা পিতা ও পত্নী ছাড়া ইহারা সকলের প্রতিই নিষ্ঠুর। অথচ ইহাঁরা এসলামের মুক্তি চান। মুক্ত এসলামের স্বরূপ ইঁহাদের কাছে 'কেমন, তাহা তাঁহারাই জানেন—হয়ত কতকগুলি দালান কোঠা, ভিন্ন জাতীয় মানুষের আভূমি নত মাথা—বালাখানার পরাধীন দাস দাসীর সেবা।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা।

নারায়ণের নিকষমণি।

ব্যক্তি ও সমাজ।—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী বি, এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বি, প্র, ভাণ্ডার গোন্দলপাড়া, চন্দননগর। মূল্য ছয় আনা রাজবন্দীরূপে আবদ্ধ থাকিবার সময় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের গতি ও স্থিতি সম্বন্ধ যে প্রশ্নগুলি লেখকের মনে উদিত হইয়াছিল সেইগুলি স্ত্রীকে পত্র লিখিবার ছলে এই পুস্তকখানির মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ, স্ত্রীলোকের কর্ম্মক্ষেত্র, সহধর্ম্মিণীর আদর্শ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। লেখকের প্রকৃতি অনেকটা রক্ষণশীল, গতি অপেক্ষা স্থিতির দিকেই তাঁহার স্বাভাবিক টান অধিক। সুতরাং সামাজিক ব্যাপারে পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করিয়াও তিনি অনেক সময় পুরাতন আদর্শকে সনাতন নাম দিয়া নূতন রূপে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে এই ভাবটী বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। 'আমাদের সমাজে নাকি স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন-হৃদয়; শুধু ভিন্ন দেহ। লেখকের মতে "তাই স্বামী দুষ্ট হইলেও স্ত্রী প্রার্থনা করে জন্ম জন্মান্তরে তোমাকেই যেন স্বামী পাই।" সত্যই কি তাহাই হয়? যুক্তিগুলি নব বিবাহিত যুবক ভিন্ন অপর কাহারও মুখে শোভা পায় না।

কিন্তু স্থানে স্থানে একদেশদর্শিতাদুষ্ট হইলেও পুস্তকখানি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। লেখকের ভাষা সরল ও মার্জ্জিত; এবং প্রত্যেক প্রবন্ধেই তাঁহার সমাজের প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

জর্ম্মনির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনুবাদিত। প্রাপ্তিস্থান ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

পুস্তকখানি Evolution of German statecraft নামে Contemporary Review পত্রিকায় যে প্রবন্ধ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হয় তাহার বঙ্গানুবাদ।

অষ্টাদশ শব্দাতীতে জর্ম্মানী ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। কিরূপ শিক্ষা ও ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া জর্ম্মানী এক 'নেশনে' পরিণত হইয়া বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া জগতকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছিল এই পুস্তকে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। মূল প্রবন্ধ ইংরাজের লিখিত; সুতরাং তাহাতে কতকটা ইংরাজ-জাতি-সুলভ সঙ্কীর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। বাংলা অনুবাদটিও সেই কারণে এক-দেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। জর্ম্মানীর রাষ্ট্রীয় জীবনে যে বক্রগতি জর্ম্মানীর অধঃপাতের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইংরেজ বা ফরাসী জাতির জীবনেও কি সেই বক্রগতি নাই?

পুরুষকার

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম, এ, বি, টি প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান অল-ইণ্ডিয়া পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড, ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।/০ আনা।

নিষ্ফল অদৃষ্টবাদের চাপ হইতে উদ্ধার পাইয়া আমাদের দেশের যুবকেরা যাহাতে আত্মনির্ভরশীল ও অধ্যবসায়ী হইয়া উঠে, সেই উদ্দেশ্যেই এই পুস্তিকাখানি রচিত।

এই সাধু উদ্দেশ্যের আমরা সফলতা কামনা করি।

পথের সাথী

শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত; প্রকাশক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় পয়সা।

পুস্তিকাখানি স্বামী স্বরূপানন্দের কতকগুলি উগদেশের সমষ্টি। উপদেশগুলি সজীব, বিদ্যুদ্গর্ভ; অসাড় প্রাণে সাড়া আসিয়া দেয়।

"ছোট বড়, উচ্চ নীচ, সকলকে লইয়া দেশ। ইহাদের কাহাকেও বাদ দিয়া তুমি দেশকে তুলিতে পার না। ছোটকে বাদ দিলে বড় ছোট হইয়া যাইবে; বড়কে বাদ দিলে ছোট ছোটই রহিবে। দেশ উঠিবে না।"

"আমরা প্রেম পাই না ; কেবল প্রেম দেই না বলিয়া। * * আমাদের যদি প্রেমই থাকিত, ঘরে ঘরে দশটা করিয়া উনান জ্বলিত না, বিশটা করিয়া জাতি হইত না, ধর্ম্ম কর্ম্ম—সব ভাতের হাঁড়িতে যাইয়া প্রবেশ করিত না।"

"এক একটা করিয়া বিপদের পাথর দিয়া যে বিরাট, বিস্তৃত মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহারই মধ্যে কীর্ত্তি দেবতার প্রতিষ্ঠা।"

"পরকে ভাল বাসিয়াছ কি ? নিজের কথা ভুলিয়া যাইয়া মুখের গ্রাস ক্ষুধিতেরে তুলিয়া দিয়াছ কি ? একটা ছাগ শিশুকে বাঁচাইতে চাহিয়া আপনার শির যুপকাঠে পাতিয়াছ কি ? যদি করিয়া থাক, উপাসনায় তোমার কিসের প্রয়োজন ?"

এই জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে আশা করি পুস্তিকাখানি সকলের নিকট আদৃত হইবে।

খুকুর জন্ম।

(শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়)

কামনা-বাসনা-রূপে হৃদয়ে লুকায়ে ছিলি
আনন্দ মুরতি ল'য়ে খুকু হ'য়ে দেখা দিলি।
সন্ধ্যার সে মেঘমাঝে এঁকেছিনু ছবি তোর
জাগিত মা তোর তৃষা রজনী হইলে ভোর।
সাগরের ঢেউমাঝে দেখেছিনু তোর মুখ
জীবনে সাধনা মোর তুই মোর সব সুখ।
বিশ্বের মঙ্গল রাশি তুই মোর মা আমার
তুই মোর ব্রতপূজা বস্তু ধ্যান ধারণার।
আঁখি তোর আনে প্রাণে বিশ্বের বারতা রাশি
স্বর্গসুধা ঢালে প্রাণে তোর ক্ষুদ্র কল হাসি।
অমৃত সমান মাগো কোমল পরশ তোর
শব্দে ফুটে কত ভাষা শুনিয়া আপনা ভোর।
সুখে তুই সুখরবি দুখে তৃপ্তি সান্ত্বনার
নারীত্বের সার্থকতা বিধাতার উপহার।

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা] [আশ্বিন, ১৩২৮ সাল।

আগমনী

[শ্রীকালিদাস রায়]

এস মা নবনী-হৃদয়া জননী মণিমঞ্জুষা করে,
হরষ ধারায় সরস করিয়া এস মা বরষ পরে॥
এস শারদ গগন মগন করিয়া শুচি জ্যোছনার বানে
বন-প্রান্তরে হরিত অরুণ ঘন তরুণিমা দানে।
এস প্রকটিয়া তারাপুঞ্জ—
এস গুঞ্জনে ভরি' কুঞ্জ—
কল কুজনে ভরিয়া নমেরুকুলায়, রঞ্জিয়া জলধরে॥

এস পয়স্বিনীর আপীন ভরিয়া মধুর গোরস রসে,
নিঃস্বের গৃহ শস্তে ভরিয়া, বিশ্ব ভরিয়া যশে।
এস পুষ্প ভরিয়া গন্ধে—
চারু মঞ্জুতা মকরন্দে—
এস হ্রদ-সরোবর ভরি কোকনদে কুমুদে ইন্দীবরে॥

এস নদনদী ভরি মীন-বৈভবে, কান্তার ভরি কাশে—
তরুলতা ভরি ফল-গৌরবে, তড়াগ ভরিয়া হাঁসে।
ভরি' শালি-সম্পদে ক্ষেত্র—
স্নেহ করুণায় ভরি নেত্র—
এস মুখরিত করি গিরিকন্দর নির্ঝর ঝরঝরে॥